জানুয়ারি ২০২৩ ■ পৌষ-মাঘ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা স্বাধীনতার পূর্ণতা

জ্ঞানের আলোয় আনন্দ মিছিল

আতশবাজি ও ফানুস ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, চিরস্থায়ী ক্ষতি

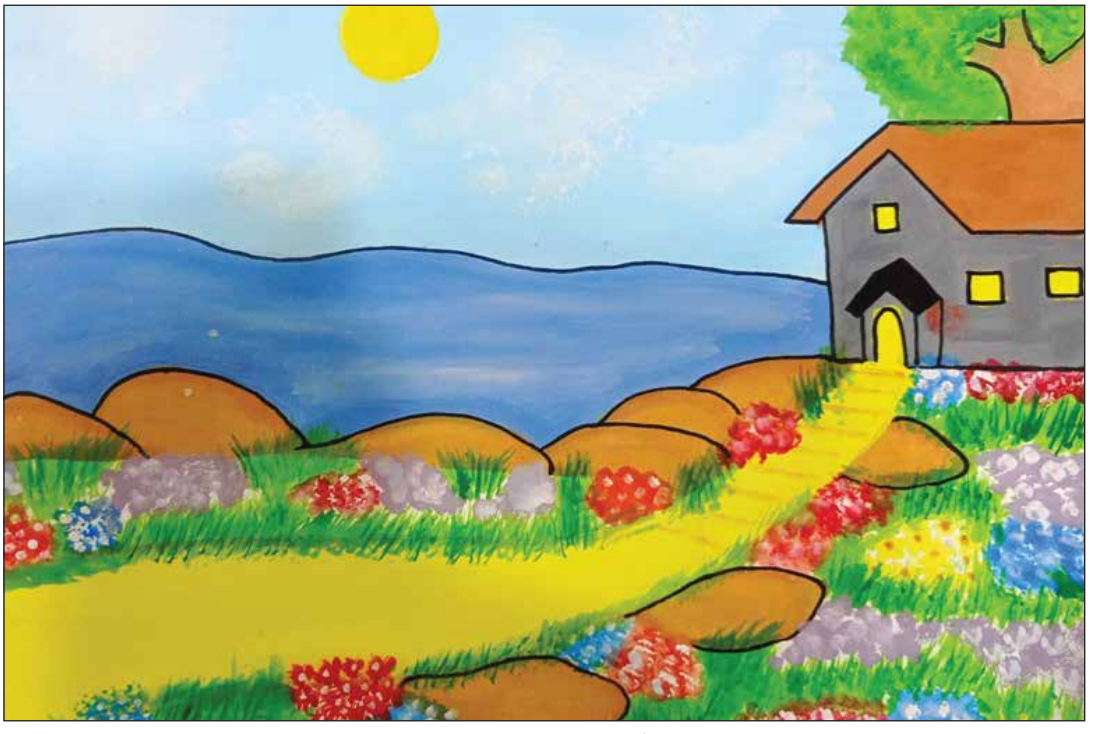

সাফিয়া নূর ঈদি, প্রথম শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল

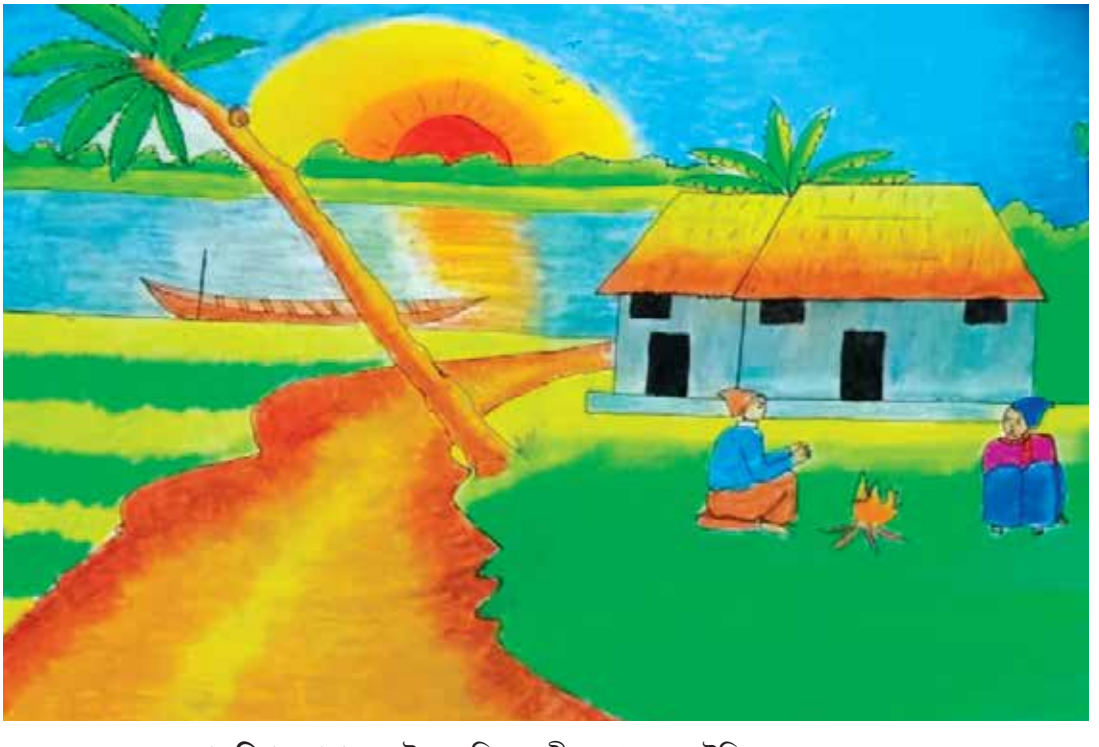

তাজরিয়ান নাহার, অষ্টম শ্রেণি, বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, বিদায় নিলো ২০২২ সাল। শুরু হলো নতুন বছর ২০২৩ সাল। বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে জানাই খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা।

নতুন বছর! নতুন ক্লাস! নতুন বই! কতই না আনন্দের তাই না ছোট্ট বন্ধুরা? প্রতি বছরের মতো এবারও শিক্ষার্থীদের হাতে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে সব মিলিয়ে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে নতুন বই দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। প্রত্যেক নাগরিক হবে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে কম্পিউটার টেকনোলজি এখন থেকে শিখছে ও আরো এগিয়ে যাবে। আমাদের পুরো জনগোষ্ঠীই হবে প্রযুক্তিজ্ঞানে স্মার্ট, বিশ্ব থেকে কোনো কিছুতেই পিছিয়ে থাকবে না। নিশ্চয়ই আমরা পারব।' বন্ধুরা, তোমাদেরও কিন্তু সকল প্রযুক্তিজ্ঞানে স্মার্ট হতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। সোনার মানুষ হতে হবে। তবেই বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলাদেশ।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা হতে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। তাই এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন আমরা বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

ছোট্ট সোনামনিরা, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধু শহিদ না হলে বাংলাদেশ আরো উন্নতির শিখরে আরোহণ করত। তাই বলে থেমে নেই সোনার বাংলার উন্নয়নের কাজ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোলমডেল। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর পর মেট্রোরেল উন্নয়নের আরেকটি মাইলফলক।

সবাই ভালো থেকো বন্ধুরা। নবারুণের সাথে থেকো।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা : স্বাধীনতার পূর্ণতা/মনি হায়দার ০৪
জ্ঞানের আলোর আনন্দ মিছিল/মুহা. শিপলু জামান ০৯
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ/লাভলী আক্তার ১২
আগামীর পথে নতুন যাত্রা/শাহানা আফরোজ ১৪
আতশবাজি ও ফানুস ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, চিরস্থায়ী ক্ষতি/আনীকা ফেরদৌস ১৭
এক পায়ে এক ঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে/এস এম মুকুল ২৫
বোতল বাগান/মৃত্যুঞ্জয় রায় ২৭
শীতের পাখি/মো. জামাল উদ্দিন ৩৬
ছন্দে ছন্দে রং বদল/আরাফাত রহামান ৩৯
যেখানে সূর্য অস্ত যায় না/মো. ইকবাল হোসেন ৫২
কালো মানিকের বিদায়/জুনায়েদ কবীর ৫৬
গৌতম বুদ্ধের কিছু অসাধারণ বাণী/নুসরাত জাহান ৫৯

গল্প

স্কুলে এলিয়েন/অলোক আচার্য ২১
ব্যালকনিতে ফুল বাগান/সুমন বনিক ৩০
একটি বীজের গল্প/মোস্তাফিজুল হক ৩২
বিড়ালের ছানা/মোহাম্মদ ইসমাইল ৪১
ব্যাঙ ও পুঁটি মাছের গল্প/তারিকুল ইসলাম সুমন ৪২
রুমকি আর পিংকি/শিবশঙ্কর পাল ৫০

সাফল্য প্রতিবেদন

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস/মিরাজ রহমান ৪০
ফুটবলের মহা আসর/মেজবাউল হক ৫৪
চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫৮
ওয়ার্ল্ড বুকে আনিসা/জান্নাতে রোজী ৬০
দশদিগন্ত /সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৬১

কবিতা ও ছড়া

০৩ আহসানুল হক/শ.ম. শহীদ
০৭ ইউনুছ আলী
০৮ ছাদির হুসাইন/সাকিবুল ইসলাম/রাজীব হাসান
১৬ সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
২৪ বিচিত্র কুমার/মাহমুদ রাজু
৩১ শেখ ফয়জুর রহমান
৩৪ শেখ বিপ্লব হোসেন/আলমগীর কবির
৩৫ রুমান হাফিজ/সামিনা সারাহ
৪৪ সুয়াইব মোহাম্মদ নাহিদ/দেলওয়ার বিন রশিদ
মো. জাহিদুল ইসলাম
৪৯ মাহবুবুর রহীম/উৎপল দত্ত
৫৫ সুজিত হালদার

ছোটোদের ছড়া/লেখা

৩৫ সাজিদা সুলতানা কথা
৪৯ তৌফিক আলম তুহিন
৫৩ মো. তৈয়বুর রহমান ভূঁইয়া

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৪৫ মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সাফিয়া নূর ঈদি/তাজরিয়ান নাহার
০৩ ত্বকী তাহমিদ রিহিন
২৬ মোহাম্মদ ইউসুফ
৪৮ মারিশা মাহপারা
৫১ সিরাজুম মুনিরা বিভা
৬৩ নাইচ আক্তার/মালিহা খানম
৬৪ হৃদয় বিশ্বাস রিক/আয়ান হক ভূঁঞা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

আলোর দিন

আহসানুল হক

নতুন বছর স্বপ্ন রঙিন
আনুক আলোর দিন
যাক মুছে যাক দুঃখ -জরা
হোক অশুভ লীন!

দিক-দিগন্তে চাই না বাজুক
শোক বিউগল বীণ
সুখ প্লাবনে বুক যে ভাসুক
ভাসুক সীমাহীন!

যাক ঘুচে যাক মন্দা-খরা
বিরূপ পরিবেশ
ফুল-ফসলে উঠুক হেসে
আমার সোনার দেশ!

নতুন বছর দিক ভুলিয়ে
বিষাদ স্মৃতির ছাপ
পুণ্য আনুক, পূর্ণতাও
মন হয়ে যাক সাফ!

ত্বকী তাহমিদ রিহিন
পঞ্চম শ্রেণি
উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নতুন বছর

শ.ম. শহীদ

নতুন বছর, এসো নতুন গানে,
ঝরনা হয়ে সুখের কলতানে।
এসো নিয়ে মুখে মুখে হাসি,
হাসির মুক্তা ঝরুক রাশি রাশি!
স্বস্তি এনো সবার প্রাণে প্রাণে !!

দুঃখ-শোকে দিশেহারা জনের–
কষ্ট যত মুছে দিও মনের!
লাঞ্ছিত আর বঞ্চিতদের পাশে
এসো তুমি সদয়-সহায় আশে!
শান্তি-বাণী শুনিও কানে কানে !!

নতুন বছর! এসো নতুন গীতে,
অতীত দিনে গ্লানি মুছে দিতে!
ক্রুদ্ধ যে হৃদ হিংসা-বিদ্বেষ নিয়ে–
সে হৃদ গড়ো সাম্য-প্রীতি দিয়ে!
নতুন বছর! ধন্য হইও দানে!

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা স্বাধীনতার পূর্ণতা

মনি হায়দার

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি... প্রাণ উজাড় করে আমরা গাই...। মনটা ভরে ওঠে কানায় কানায়। ১৯৭১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটি গাইতো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। এখন গায় প্রায় বিশ কোটি বাঙালি। অসাধারণ সুরের ও মায়ায় মোড়ানো এই গানটি গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাঙালির মহান নেতা বন্দি পাকিস্তানের কারাগারে। থাকছেন নির্জন কারাবাসে। জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার বিচারের নামে নির্দোষ বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার দূরের দেশে বাঙালির নেতা বন্দি থাকলেও মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন বঙ্গবন্ধুর নামেই। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শেষে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধের ময়দানে যাবার সময়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখরিত করে যাত্রা করত। যুদ্ধ করতে করতে নয় মাস পর পাকিস্তানি হায়েনা সৈন্যদের পরাজিত করে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় ছিনিয়ে আনে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হার্মাদ সৈন্যরা দীর্ঘ নয় মাস লড়াই করে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। উদিত হয় পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন

স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ। কলকাতা থেকে মুজিবনগর সরকার চলে আসে বাংলাদেশে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। বাংলার জলে-স্থলে সুরে সুরে বাজছে স্বাধীনতার গান। কিন্তু ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণ আর পবিত্র সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নেই কোনো আনন্দ, নেই কোনো উল্লাস।

কারণ বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর শোক। ঘরে ঘরে মাতম আর প্রিয়জন হারানোর হাহাকার। বিপরীতে যেই নেতার অঙ্গুলি নির্দেশে বাঙালির মরণপণ লড়াই- সেই নেতা কোথায়? যিনি নিজের জীবন বাজি রেখে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, ফাঁসির মঞ্চে গেছেন কিন্তু সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতার প্রশ্নে শির নীচু করেননি, সেই নেতা কোথায়?

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি পাকিস্তানের কারাগারে। এত সাধের, এত ত্যাগের স্বাধীনতা পাওয়ার পরও বাঙালির চেতনায় নেই শান্তি, নেই সুখ। নেতা কোথায়? নেতা ছাড়া এই স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই, সুখ নেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ছুটে গেলেন ভারতে। ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সাহায্যকারী দেশ। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্বজনমত তৈরি করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধুকে চির স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার জন্য। এদিকে বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নির্মম পরাজয়ের কারণে পাকিস্তানের জনগণ ক্ষেপে যায়। রাস্তায় নেমে আসে পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি জটিল বুঝতে পেরে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা দেয় মি. জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে। চতুর ভুট্টো বুঝতে পারে- বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতাকে আটকে রাখলে বাংলাদেশের হাতে বন্দি নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ফেরত আসবে না। ফেরত না আসলে সাধের ক্ষমতাও ভোগ করা যাবে না। বাধ্য হয়ে ভুট্টো ১৯৭২ সালের আট জানুয়ারি মধ্য রাতে পাকিস্তানের একটা বিমানে তুলে দেয় বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি পরেরদিন খুব ভোরে লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মি. সাদারল্যান্ড, বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা রেজাউল করিম, মহিউদ্দিন আহমেদ ও মহিউদ্দিন জোয়ারদার বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু এয়ারপোর্টে নেমে রেজাউল করিমের গাড়িতে ব্রিটেন সরকারের ব্যবস্থাপনায় লন্ডনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে ওঠেন। দীর্ঘ নয় মাস পর তিনি হলেন মুক্ত মানুষ। আট ডিসেম্বর বাঙালি জাতির প্রাণপ্রিয় নেতার মুক্তির খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে সেই খবর চলে আসে বাংলায়, বাংলার মানুষের কাছে। নেতার মুক্তির খবরে বাঙালিরা জেগে ওঠে জয় বাংলার অবিস্মরণীয় আনন্দ আর উল্লাসে।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করলেন, বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন থেকে। তিনি সেই দিনই দেখা করলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন-১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট-এ। সহায়তা চাইলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপন্ন স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের জন্য। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত রাজকীয় কমেট বিমানে চড়ে বঙ্গবন্ধু যাত্রা শুরু করলেন সেই দিন দুপুরে প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশে আসার পথে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে থামলেন দিল্লিতে। দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয় সংবর্ধনা। দিল্লি থেকে বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি যাত্রা শুরু করলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। বিকেলের একটু আগে বঙ্গবন্ধুকে বহন করা ব্রিটেনের রাজকীয় বিমানটি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে, তেজগাঁওয়ের বিমানবন্দরে অবতরণের আগেই লক্ষ জনতায় ভরে যায়।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাঙালি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি বা ফিরে আসার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে রোজা রেখেছিলেন। যেদিন বাংলাদেশের জনগণ জানতে পারে, পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু, সেদিনও স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জানান অনেক বাঙালি। বাংলার মানুষদের যেমন ভালোবেসেছেন বঙ্গবন্ধু, তেমনি বাংলার সাধারণ মানুষও ভালোবেসেছিল মহান নেতাকে। নেতার মুক্তির জন্য রোজা রাখাই প্রমাণ করে– তিনি কতটা জনগণের মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

ছিল ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। ১০ই জানুয়ারি সত্যি বাংলাদেশের জনগণের জন্য মহা ঐতিহাসিক দিন। তিনি এলেন, আমরা বিজয়ী হলাম। তিনি এলেন, আমরা পূর্ণ হলাম। তিনি এলেন, বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করল। তিনি এলেন, ১০ই জানুয়ারি বাঙালির চেতনায় স্বাধীনতার সূর্য উদিত হলো।

বঙ্গবন্ধু ভাষণে বললেন, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার

তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ট্রাকযোগে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সহযোদ্ধা-প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ ধীরে ধীরে সেই স্থানে এসে উপনীত হলেন– যেখানে তিনি ৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন, যেখানে মাত্র কয়েকদিন আগে হার্মাদ হায়েনা পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে, ঠিক সেই জায়গায় এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন অশ্রুসিক্ত চোখে। মনে রাখা দরকার দিনটি

প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম লও।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। খেয়ে পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি

বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না।

বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। কী অসাধারণ ত্যাগ। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময়ে আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার লাশ আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিও...। পড়তে পড়তে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে আমাদের মন ও চিত্ত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি টুঙ্গিপাড়ার খোকার ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২-এ ফিরে আসার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে যায় ইতিহাসের কাছে, সত্যের দুয়ারে, আর চির সুন্দর সোনার বাংলার কাছে...

আজ এত বছর পরও ভাবলে অবাক হই, পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংস আক্রমণে পর্যুদস্ত বাংলাদেশে যদি বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসতেন, যদি পাকিস্তানের সরকার বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিয়ে দিত, তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেমন হতো– ভাবতেই পারি না। কারণ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল কাজের, ইচ্ছের এবং বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার একমাত্র অভিভাবক। তিনি কেবল নেতা ছিলেন না বাঙালি জাতির তিনি ছিলেন দরদি মনের পিতাও। তিনি যেভাবে নিজের ছেলেমেয়েদের আদর করতেন, ভালোবাসতেন, ঠিক সেইভাবে বাংলার দুঃখী জনগণকেও ভালোবাসতেন। সারাটা জীবন তিনি বাংলার দুঃখী জনগণের দুঃখ মোচনের লড়াই করেছেন। সেই লড়াইয়ের ফল, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ। আর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পূর্ণতার দিন, যেদিন তিনি বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে। ■

শিশুসাহিত্যিক

নেতার প্রত্যাগমন

ইউনুছ আলী

হাসল সেদিন আকাশ-বাতাস
হাসলো মাটি-পানিও,
শিশু-কিশোর উঠল হেসে-
সাথে নানা-নানিও।

হাসল সুরমা-ধলেশ্বরী
ফুটল হাসি তিস্তারও,
হাসির জোয়ার দেশব্যাপী
করল দ্রুত বিস্তারও।

সবার মুখে মিষ্টি হাসি
নেতার প্রত্যাগমনে,
সফল ছিলেন শেখ মুজিবুর
পাক হানাদার দমনে।

সবার জন্য শিক্ষা

ছাদির হুসাইন

শিক্ষা চাই সবার জন্য
সু-শিক্ষাতেই জাতি ধন্য।
শিক্ষা দিন-শিক্ষা নিন
শিক্ষায় থাকুন প্রতিদিন।

শিখতে হবে ভাবতে হবে
শিক্ষা মনে রাখতে হবে।
শিখতে দিন ভাবতে দিন
শিক্ষা মনে জাগতে দিন।

গড়তে হবে সমাজটারে
শিক্ষা দিয়ে সবার দ্বারে।
শিক্ষা নিতে লজ্জা নাই
সবার জন্য শিক্ষা চাই।

দেশ ও জাতির উন্নয়নে
শিক্ষা থাকুক সর্বক্ষণে।
শিক্ষা নিয়ে কথা বলা
শিক্ষা দিয়ে জীবন চলা।

আসুন সবাই শপথ করি
সু-শিক্ষাতে জীবন গড়ি।
শিক্ষার অভাব যেখানেই
শিক্ষা ছড়াই সেখানেই।

আনন্দের বই

সাকিবুল ইসলাম

নতুন বই হাতে নিয়ে
ছুটছে সবাই আনন্দে
মজার সব ছড়া-কবিতা
পড়বে ছন্দে ছন্দে।

দলবেধে হই হুল্লোড়ে
মাতবে সবাই স্কুল মাঠে
টিং টং ঘণ্টা বাজলেই
ছুটবে শ্রেণির পাঠে।

সপ্তম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়
দাউদকান্দি

নতুন বই

রাজীব হাসান

নতুন বছর নতুন বইটা
পেয়ে সবাই হাতে
খোকা-খুকি বসে আছে
বাবা-মায়ের সাথে।

নতুন বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে
নানান ছড়ায় ভরা
ছড়ার ছন্দে জীবনটাকে
ছড়ার মতোই গড়া।

ছড়ার তালে নতুন বইয়ে
নতুন করে ছোঁয়া
মিষ্টি মধুর ছড়ার তালে
কমল হাতটা ধোয়া।

নতুন বছর শুরুটা হোক
নতুন বইয়ের সাথে
যখন তখন পড়তে বসে
সকালে আর রাতে।

জ্ঞানের আলোর আনন্দ মিছিল

মুহা. শিপলু জামান

বই মানুষের পরম বন্ধু। বই একজন মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থভাবে সঙ্গ দিতে পারে। বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক আরনেস্ট হেমিংওয়ের মতে, 'বইয়ের মতো এমন বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই'। ভালো কিংবা খারাপ সকল সময়ে বই আমাদের উত্তম আশ্রয়স্থল, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আদর্শ জীবন গঠনে বইয়ের বিকল্প নেই। সে প্রেক্ষিতে স্বনামধন্য দার্শনিক মার্ক টোয়েন বলেছেন, 'ভালো বন্ধু, ভালো বই এবং একটি শান্ত বিবেক; এটি আদর্শ জীবন।' বই হলো সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস যেখান থেকে মনের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো আত্মশিখন আর বই হলো আত্মশিখনের প্রধান উপাদান।

কথা বলতে শুরু করার কিছুদিন পরেই একটি শিশু নিজ গৃহে বই পড়া শুরু করে যাকে আমরা বলি হাতেখড়ি। ধীরে ধীরে শিশুটি লেখাপড়া শিখতে থাকে, অনেক অনেক বই পাঠ করে তন্মধ্যে কিছু তার পাঠশালার বা কোর্সের অংশ হিসেবে আর কিছু সে জ্ঞান ও আনন্দের জন্য পড়ে। মানবজীবন প্রবাহের যাবতীয় ভাব-অনুভূতি জানার প্রবল আগ্রহ মানুষকে বইমুখী করে। কারণ সময়ের আবর্তনে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার অনুভূতি ধারণ করে অনাগতকালের মানুষের জন্য চির অপেক্ষমান হয়েছে চিরযৌবনা বই। অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের মাঝে যোগসূত্র রচনা করে বই। আর তাই বই পড়ে মানবমন অনাবিল প্রশান্তি লাভ করে (সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি ২০২৩)। শিশুকাল থেকে শুরু করে সারাজীবন মানুষ অনেক বই পড়ার পাশাপাশি অনেকে নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে বই লিখেন যা অন্য মানুষকে নতুন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে। জ্ঞান আহরণে কিংবা আনন্দের জন্য বইগুলো মানুষ তাদের পছন্দমতো

সংগ্রহ করলেও স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে পড়ার বইগুলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর সে বিষয়টি বিবেচনা করে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের জন্য এক অনন্য নজির গড়েছে; বছরের প্রথমদিনে শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন বই বিনামূল্যে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় (সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি ২০২৩)। বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের বইসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং স্কুলের পাঠ্যবইসমূহ সরকার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। নতুন বছরের শুরুতে নতুন শিক্ষাবর্ষে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে সরকার উৎসবের আমেজে নতুন বই তুলে দেয়। কোমল হাতে নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে আত্মহারা হয়। বাংলাদেশের সকল স্কুলে বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে একযোগে পাঠ্যবই প্রদানের এই আয়োজনকে 'বই উৎসব' নামে অভিহিত করা হয়। বই উৎসব বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। বই উৎসবের দিনটা সকল শিক্ষার্থীর কাছেই আনন্দের। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নেওয়ার মজা প্রত্যেক শিক্ষার্থীই অনুভব করে। তাই নতুন বই মানেই নতুন পাঠ, নতুন জ্ঞান, নতুন আনন্দ। তবে অবশ্যই নতুন পাঠটি হতে হবে নির্ভুল ও সঠিক তথ্য সংবলিত (ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩)।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সংকট নিরসনে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে বছর সরকার ২৯৬ কোটি ৭ লাখ টাকার পাঠ্যপুস্তক প্রদানের উদ্যোগ নেয় এবং ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি বই উৎসব উদ্‌বোধন করা হয় (উইকিপিডিয়া)। একদিনে বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে একযোগে বই প্রদানের এই উৎসব বিশ্বে এই প্রথম যা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়। বাঁধভাঙা উল্লাস আর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে খুদে শিক্ষার্থীরা খালি হাতে এসে হাতে বই আর চোখে স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এ সময় নতুন বইয়ের মন মাতানো ও আকর্ষণীয় সোঁদা গন্ধে ভরে উঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। বই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হলো বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই ও পাঠ্যক্রম থেকে ভয় দূর করে আনন্দের সাথে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা।

২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রতিবছরই বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এবারও পহেলা জানুয়ারি সারা দেশে পালিত হয় বই উৎসব। যদিও কাগজ সংকটসহ নানামুখী সমস্যায় সকল শিক্ষার্থীকে সব বই একসাথে দেয়া সম্ভব হয়নি তবে এক মাসের মধ্যেই শতভাগ বই দেওয়া সম্পন্ন করা হবে। উৎসবের দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বই তুলে দিয়ে এই কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। পরে প্রাথমিক স্তরের মূল উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। কনকনে শীত উপেক্ষা করে রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি স্কুলের হাজার খানেক শিক্ষার্থী ও তাদের সাথে আসা শিক্ষক ও অভিভাবকগণ। শিশুদের মুখে ছিল রাজ্যের হাসি যেন বসেছিল এক উল্লাসের হাট। পুরো মাঠ সেজেছিল রংবেরঙের পতাকা, বেলুন আর ফুল দিয়ে সাজানো চারিদিকে। ছিল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবের আমেজ। (সমকাল, ২রা জানুয়ারি ২০২৩)। ঢাকার পাশাপাশি অন্যান্য জেলায়ও আনন্দের বারতা নিয়ে উদযাপন করা হয় বই উৎসব। মাধ্যমিক স্তরের কেন্দ্রীয় বই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। মহামারি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও সরকার শিশুদের হাতে বই প্রদানের এই আয়োজন চলমান রেখেছে। এ বছর সারা দেশে ৪ কোটি ৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৮১ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৩ কোটি ৯১ লক্ষ ১২ হাজার ৩০০ কপি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮২৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ করা হবে (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২রা জানুয়ারি ২০২৩)। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে মোট ৪৩৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৪১টি বই বিতরণ করা হয়েছে (সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি ২০২৩)।

এবারের বই উৎসবে শিক্ষক-ছাত্র সকলের মুখে ব্রত ছিল– 'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'। উৎসবে শিক্ষার্থীদের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে যথাযথ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পাশাপাশি এবার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়ন দলের কয়েকজন সদস্য যা উৎসবে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছিল। তাঁরা উপস্থিত শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করারও উৎসাহ প্রদান করেন।

সর্বজনীন এই উৎসবের মহত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে আমাদের বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে চিন্তা করলেই মহৎ এই উদ্যোগের গুরুত্বকে বোঝা যায়। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন কৃষকের সন্তান যখন বিনামূল্যে পাঠ্যবই পায় তখন সে শিক্ষার্থীর সাথে পরিবারের মুখের হাসিই যথেষ্ট বই উৎসবের তাৎপর্য বুঝতে। বিনামূল্যে বই পেয়ে অনেক পরিবারের শিক্ষার খরচ কমে আর্থিক কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয় ফলে স্কুল থেকে ঝরে পরার হারও কমে। শুধু বই নয় স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে এবং নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে অবৈতনিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে সাড়ম্বরে উদযাপিত বই উৎসবকে অর্থবহ করতে মানসম্পন্ন শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে। আর তখনই বই উৎসব হয়ে উঠবে শিক্ষার আলোর আনন্দ মিছিল।

শিক্ষা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক। শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলেও আমাদের বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে আরো এগিয়ে যাবে। আমরা আশা করি শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মৌলিক, মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার ভীত রচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের স্মার্ট ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। ■

তথ্যসূত্র:

১. নতুন বই হাতে বাঁধভাঙ্গা উল্লাস সোনামণিদের, দৈনিক সমকাল, ২রা জানুয়ারি ২০২৩
২. বই উৎসব-এ কৃতিত্ব ধরে রাখতে হবে, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২রা জানুয়ারি ২০২৩
৩. স্কুলে স্কুলে বইয়ের উৎসব, দৈনিক প্রথম আলো, ২রা জানুয়ারি ২০২৩
৪. বই উৎসব: পাঠ হোক আনন্দময়, মাহতাব হোসাইন মাজেদ, দৈনিক সংবাদ, ৩রা জানুয়ারি ২০২৩
৫. বই উৎসব নিয়ে কিছু কথা, আলিম-উর-রহিম, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩
৬. উইকিপিডিয়া

উপপ্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

লাভলী আক্তার

স্বাধীনতার পর অর্থনীতির মুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশে এখন রেমিটেন্স বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে, বেড়েছে কর্মসংস্থান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত বাংলাদেশ নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এক যুগের বেশি সময় ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের গুণে সারাবিশ্বের সামনে নিজেকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা পরবর্তীকালে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিজের অর্থে শুধু পদ্মা সেতুই নয় বরং সারাবিশ্ব থেকে করোনার টিকা সংগ্রহ করে কোভিড উত্তরণে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সাহসী বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের সূচকের বিচারে গত দুই দশকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জনসংখ্যা, গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের অন্য দেশগুলোকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে আজকের বাংলাদেশ। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অনেক সূচকে কেবল দক্ষিণ এশিয়াকেই নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এক দশক আগে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করা হয়েছিল তার বাস্তবায়নের সুফল আজ সমগ্র জাতি ভোগ করছে। সরকারি সেবার ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাইজেশনের ফলে অপচয় কমিয়ে মানসম্পন্ন সেবা পৌঁছে যাচ্ছে জনগণের দ্বারপ্রান্তে।

গুণ-মানের অপূর্ণতা সত্ত্বেও গত এক দশকে শিক্ষা বিস্তারে দেশ যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাথমিকে নেট এনরোলমেন্ট রেট ৯৮ শতাংশ, মাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ। উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার চার লাখ থেকে বেড়ে ১০ লাখে দাঁড়িয়েছে। কারিগরিতে ভর্তির হার ছয় বছরে ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে। প্রতিবন্ধীসহ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নানামুখী বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সরকারের ২৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। এই খাতে সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করেছে যেখানে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪.৫ কোটি। বিগত ১৪ বছরে দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হতে পেরেছে। দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৫৪৩ ডলার থেকে ২৮২৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৫৩.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪,৬৬ শতাংশ হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ ৭৬ শতাংশ হয়েছে, মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বেড়েছে আশাতীত হারে। গ্রামীণ জীবনমান বেড়েছে ঈর্ষণীয় মাত্রায়। বাংলাদেশে রূপকল্প ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২০), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ নামে শতবর্ষের একটি পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে এসডিজি

লক্ষ্যমাত্রাগুলো সম্পৃক্ত করণ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন

- স্বপ্নের পদ্মাসেতু উদ্‌বোধন
- সকলের কাঙ্ক্ষিত প্রথম মেট্রোরেল উদ্‌বোধন
- দেশের ২৫টি জেলায় একযোগে ১০০টি সড়ক সেতুর উদ্‌বোধন
- দেশের ৫০ টি জেলায় একযোগে ১০০টি মহাসড়কের উদ্‌বোধন
- একযোগে দেশে ৫০টি শিল্প ও অবকাঠামোর উদ্‌বোধন
- পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন
- রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন
- দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪২১ টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ
- দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা নিশ্চিত
- ৭ লক্ষ ১১ হাজার ২৬৩ টি পরিবারকে বিনামূল্যে জমি ও গৃহ প্রদান।

নানা সংকট মোকাবিলা করেও বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্জন নিয়ে এগিয়ে চলছে। দীর্ঘদিনের অচলায়তন ভেঙে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ এবং মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে শামিল হওয়ার উপযোগী হয়েছে দেশটি। বর্তমানে দেশটি সমৃদ্ধির পথে আরো কয়েক ধাপ এগিয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সূত্র ধরেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। 'ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এ চেতনাই বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাক আপন মহিমা নিয়ে। ■

প্রাবন্ধিক

আগামীর পথে নতুন যাত্রা

শাহানা আফরোজ

দিনপঞ্জির পাতায় সোনালি দিন হয়ে থাকল ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২। অহংকারের পাতায় যুক্ত হলো আরেকটি স্বর্ণপালক। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বর্ণালি এই দিনে সবুজ পতাকা উড়িয়ে মেট্রোরেলের উদবোধন করেন। লাল-সবুজের বাংলাদেশ প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে। দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশে প্রধানমন্ত্রী নিজেই মেট্রোরেলের প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রার অংশ ছিলেন। ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে জনসাধারণের চলাচলের জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়।

এক নজরে ঢাকা মেট্রোরেল

- **প্রকল্পের নাম:** ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬
- **প্রকল্পের ধাপ:** ৮
- **উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা:** জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)
- **অর্থায়ন:** বাংলাদেশ সরকার ২৫% ও জাইকা ৭৫%
- **প্রকল্পের বাজেট:** ৩৩,৪৭১.৯৯ কোটি টাকা
- **পরিচালনা সংস্থা:** ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)
- **ডিএমটিসিএলের রূপকল্প:** বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ, যানজট কমাবে মেট্রোরেল
- **পরিকল্পনা গ্রহণ:** ২০১২ সাল
- **ডিএমটিসিএল গঠনের তারিখ:** ৩রা জুন, ২০১৩
- **নির্মাণকাজ উদ্‌বোধন:** ২রা জুন, ২০১৬
- **নির্মাণ কাজ শুরু:** ২০১৭ সালে
- **মেট্রোরেল উদ্‌বোধন:** ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২
- **প্রকল্পের সমাপ্তি:** ২০২৫ সাল (সম্ভাব্য)
- **দৈর্ঘ্য:** উত্তরা থেকে কমলাপুর প্রায় ২২ কিমি
- **গেজ:** স্ট্যান্ডার্ড গেজ (১,৪৩৫ মিলিমিটার)
- **প্রস্তাবিত পথের দৈর্ঘ্য (ভায়াডাক্ট):** ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার
- **সাপ্তাহিক বন্ধ:** মঙ্গলবার

- **মেট্রো ট্রেনের সংখ্যা:** ২৪ সেট
- **প্রতিটি ট্রেনে কোচ সংখ্যা:** ৬(প্রতিটি কোচ এসি)
- **প্রতি ট্রেনের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা:** ২,৩০৮ জন (মাঝের ৪টি কোচের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৩৯০ জন এবং ট্রেইলার কোচের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৩৭৪ জন)
- **পরিচালনা প্রযুক্তি:** কমিউনিকেশন বেইজড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (সিবিটিসি)
- **প্রথম নারী চালক:** মরিয়ম আফিজা
- **সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি:** ১০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা
- **যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা:** ঘণ্টায় ৬০ হাজার এবং দৈনিক ৫ লাখ
- **স্টেশন সংখ্যা:** ১৭ (উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর ১১, মিরপুর ১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর)
- **ট্রেনের বিদ্যুৎ চাহিদা:** একটি ট্রেন উত্তরা থেকে আগারগাঁও আসতে বিদ্যুৎ লাগবে ২ হাজার টাকার
- **বিদ্যুতের উৎস:** জাতীয় গ্রিড (উপকেন্দ্র ৫টি : উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও হোটেল ও বাংলা একাডেমি এলাকা)
- **মেট্রোরেলের ভাড়া:** সর্বনিম্ন ২০ টাকা। এরপর প্রতি দুই স্টেশন পর ১০ টাকা করে ভাড়া যোগ হবে। উত্তরা স্টেশন থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভাড়া হবে ৬০ টাকা
- **মেট্রোরেলের টিকিট/কার্ড:** প্রথম দিকে স্থায়ী ও সিঙ্গেল জার্নির জন্য কার্ড মেট্রোরেল স্টেশন থেকেই কিনতে হবে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যাংক ও অনলাইনে রিচার্জ / কেনা যাবে
- **টিকিট/কার্ডের মেয়াদ:** ১০ বছর মেয়াদি স্থায়ী কার্ড কিনতে হবে ২০০ টাকা দিয়ে। যাতায়াতের জন্য টাকা রিচার্জ করে নিতে হবে প্রয়োজনমতো। স্থায়ী কার্ড পেতে নিবন্ধন করতে হবে। সিঙ্গেল জার্নি কার্ড নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করে নিতে হবে। ট্রেন থেকে নামার সময় সেটা ফিরিয়ে নেয়া হবে যাত্রীর কাছ থেকে কার্ড দেওয়া ছাড়া স্টেশন থেকে বের হতে হওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়ার সুবিধা থাকছে না। তবে স্থায়ী কার্ড নিলে ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট পাবে সবাই
- **সময়সূচি :** উদ্‌বোধনের পর থেকে প্রথম কিছুদিন সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করবে মেট্রোরেল। তবে গেট খোলা হবে ৮টা থেকে আর বন্ধ হবে ১২টায়। উত্তরা ও আগারগাঁও ছাড়াও ২৫শে জানুয়ারি ২০২৩ থেকে থামবে পল্লবী স্টেশনে। ধীরে ধীরে মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রেন সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রতি স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামার জন্য ১০ মিনিট করে থেমে থাকবে ট্রেন
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থা :** মেট্রোরেলের নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে Communication Based Train Control System (CBTC) Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার নিমিত্ত সিসি ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরুরি মুহূর্তে বের হতে ইমার্জেন্সি এক্সিট রয়েছে। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা হিসেবে স্বয়ংক্রিয় Sprinkler ও Water Hydrant সংযোজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত MRT Police Force গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে। তার আগ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরাপত্তা প্রদান করবে
- **স্টেশনের সুবিধা:** নামার জন্য দুটি লিফট,দুটি এসকেলেটর,দুটি সিঁড়ি, একটি কক্ষে প্রাথমিক সেবার সরঞ্জাম থাকবে প্রতি স্টেশনে। ডিজিটাল মনিটর যেখানে দেখা যাবে ট্রেনের বর্তমান অবস্থান। থাকবে না কোনো হকার ও কুলি স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আছে বিআরটিসি সার্ভিসের ব্যবস্থা
- **বিশেষ সুবিধা:** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ভাড়া লাগবে না। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা, নারীদের জন্য থাকছে আলাদা কোচ।

যানজটের নগরীতে আশির্বাদ মেট্রোরেল। বাঁচবে মূল্যবান সময়, সাশ্রয় হবে জ্বালানি, কমবে পরিবেশ দূষণ,নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে নগরীর। আমরা তো বলতেই পারি– ঘুরল চাকা মেট্রোরেলের,বদলে যাবে চিরচেনা ঢাকা।■

রেলে চড়া মজা

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

মেট্রোরেল চলে এল
চলো যাই চড়তে,
এই রেলে চড়ে রোজ
যাব আমি পড়তে।
রোজ রোজ ইশকুলে
রেলে চড়ে যাব,
ঝকঝক ঝকঝক
কী যে মজা পাব!
আর নয় যানজট
রেল রোডে জ্যাম নেই,
তাই বলি রেলে চড়ো
রেলে চড়া মজা এই।

আতশবাজি ও ফানুস
ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, চিরস্থায়ী ক্ষতি

আনীকা ফেরদৌস

নববর্ষ উদযাপন হোক কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠান, সাকরাইন অথবা প্রিয় দলের বিশ্বকাপ জয়– যে-কোনো ছুতো ধরে আতশবাজি ফুটিয়ে আনন্দ করা এখন খুবই সাধারণ একট ঘটনা। শিশু-কিশোর ও যুবকদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। বিশেষত পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই বাড়ির ছাদে একত্রিত হয়ে আতশবাজি ফুটিয়ে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ বরণ করে নেয়া যেন আমাদের শহুরে সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা বাজার আগে থেকেই ঢাকার আকাশ রঙিন হয়ে উঠে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের আলোয় আর তার পাশাপাশি আতশবাজি ফুটানোর পিলে চমকানো মুহুর্মুহু আওয়াজ তো আছেই।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কী আছে এই আতশবাজিতে? কেন আতশবাজি ফুটালে এমন বিকট শব্দ আর রং-বেরঙের আলোকের ছটা দেখা যায়? এর পিছনে আছে বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন এবং কিছুটা পদার্থবিদ্যা। প্রথমে আমরা জেনে নেই আতশবাজির ভিতরে কী আছে। রসায়নবিদদের মতে, আতশবাজির মধ্যে থাকে একটি সহজদাহ্য (explosive) মিশ্রণ। একটি আতশবাজিতে ৭৫

শতাংশ পটাশিয়াম নাইট্রেট অথবা পটাশিয়াম ক্লোরেট, ১৫ শতাংশ চারকোল এবং ১০শতাংশ পর্যন্ত সালফার থাকতে পারে। আতশবাজি পোড়ালে তিন প্রকারের শক্তি উৎপন্ন হয়– শব্দ, আলো এবং তাপ। আতশবাজির বর্ণচ্ছটার পিছনে দায়ী বিভিন্ন রকমের ধাতব লবণ: লিথিয়াম লবণের জন্য গোলাপি রং, সোডিয়াম লবণের জন্য হলুদ বা কমলা রং, কপার (তামা) এবং ব্যারিয়াম লবণের জন্য সবুজ বা নীল রং হয়ে থাকে। আর স্ট্রন্সিয়ামের লবণ দেয় লাল রঙের আলো। বিভিন্ন রকম আতশবাজিগুলোতে যখন আগুন দেয়া হয় তখন একটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধাতব লবণ এবং কেমিক্যাল এক্সপ্লোসিভ (পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার) অক্সিজেনের সাথে দহন বিক্রিয়া (Combustion reaction) করে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তির পাশাপাশি উৎপন্ন হয় ধোঁয়া ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের মতো প্রাথমিক কিছু গ্রিন হাউস গ্যাস। আর দহন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপ দ্রুতগতিতে বের হয়ে আসে এবং আশপাশের বাতাসকে শব্দের গতির চাইতেও দ্রুততার সাথে প্রসারিত করে। বাতাসের এই প্রসারণই একটি শক ওয়েভ তৈরি করে যা আমরা বিকট শব্দ হিসেবে শুনতে পাই। এই শব্দের তীক্ষ্ণতা ১৫০ থেকে ১৭৫ ডেসিবেল পর্যন্ত হতে পারে।

আতশবাজি পুড়িয়ে রং-বেরঙের আলোয় আকাশ আলোকিত করে উৎসব উদ্‌যাপন করতে করতে আমরা অনেক সময় আমাদের আশপাশে থাকা শিশু, বৃদ্ধ,হার্টের অসুখে ভোগা রোগী এবং অসহায় পশু-পাখিদের কথা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই এই চোখ ধাঁধানো আলো এবং কান ফাটানো শব্দ শুধুমাত্র তাদের জন্য কষ্টদায়ক না, অনেক সময় হতে পারে মৃত্যুরও কারণ।

২০২২ সালের নববর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্যে ফাটানো আতশবাজির শব্দে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় প্রাণ হারায় ৪ মাস বয়সি একটি শিশু। শিশুটি জন্মগত ভাবেই হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল, তার দুর্বল হৃদয় এই বিকট শব্দের অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। খুবই হৃদয়বিদারক একটি মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জন্য প্রাণঘাতী হওয়ার আরো আগে থেকে আতশবাজি আমাদের আশপাশে থাকা পশু-পাখিদের জন্য মৃত্যুর সমন বয়ে আনছে। ধোঁয়া, আলোর ঝলকানি এবং পিলে চমকানো আওয়াজে পশু পাখি দিগ্‌বদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং নানারকম দুর্ঘটনার শিকার হয়। আতশবাজির এই প্রাণ সংহারক রূপ প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমে উঠে আসে ২০২১ সালে। ইতালির রোম শহরের একটি ট্রেন স্টেশনের বাইরে হাজার হাজার স্টারলিং পাখির নিথর দেহ পরে থাকতে দেখা যায়। কোনো সঠিক কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও, ধারণা করা হয় যে আতশবাজি ফাটানোর পরে যে প্রচণ্ড আওয়াজের সৃষ্টি হয় তার ফলস্বরূপ ব্লান্ট ফোর্স ট্রমার কারণে পাখিগুলোর মৃত্যু হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর দ্যা প্রটেকশন অফ এ্যানিম্যাল রাইটস (IOPA) এই ঘটনাটিকে 'ম্যাসাকার' বলে ঘোষণা দিয়েছে। পরিবেশবিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাখিদের সংখ্যা কমার পিছনে আতশবাজিকে দায়ী মনে করছেন। আতশবাজির পাশাপাশি ফানুসের কারণেও বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনার

সূত্রপাত হতে পারে। গত বছর ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ৭টি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছিল। এই বছর তো ফানুসের কবলে পড়ে সদ্য চালু হওয়া মেট্রো রেলকেই দুই ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

আতশবাজি পোড়ানোর আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য প্রভাব হচ্ছে পরিবেশগত ক্ষতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এইচ এম সাদাত এর ভাষ্য মতে– পটকা, আতশবাজি, ফানুসসহ এসব কার্যক্রম আবাসিক এলাকার জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। ফানুস থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। পটকা, আতশবাজিতে শব্দদূষণ হচ্ছে। তাতে পরিবেশের ক্ষতির সাথে মানসিক বড়ো ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। [সূত্র: দৈনিক আনন্দবাজার, তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২] ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় রোববার (১লা জানুয়ারি, ২০২৩) ঢাকার বাতাস ছিল চরম দূষিত। বায়ুমান সূচকে (একিউআই) বেলা ১ টায় রাজধানীর অবস্থান ছিল ২৪৭, যাকে 'অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। এরকম সময়ে শ্বাসতন্ত্রের জটিলতায় আক্রান্ত ব্যাক্তি ও শিশুরা খোলা আকাশের নিচে বের হবে না। রাজধানীর স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং Centre for Atmospheric Pollution Studies(CAPS) এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদারের মতে আতশবাজি সাধারণভাবেই পরিবেশের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এর ফলে অধিক পরিমাণে বায়ু ও শব্দদূষণ ঘটে। গত পাঁচ বছরে নতুন বছরের আগের রাত থেকে পরের রাত ঢাকার বায়ুদূষণ ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায় বলে তারা জরিপে দেখেছেন। তাছাড়া থার্টিফার্স্ট নাইটে রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে শোরগোলের (নয়েজ) পরিমাণ বেড়েছে ১১৩ শতাংশ! [সূত্র: বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, তারিখ: ২রা জানুয়ারি,২০২৩]। আতশবাজিতে ব্যবহৃত সালফার পুড়ে (অক্সিজেনের সাথে দহন বিক্রিয়া করে)

সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি করে যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী। জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়েচ ভ্যালী (Deutche Welle)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক রাতে আতশবাজি পুড়ানোর ফলে যে পরিমাণ ধোঁয়া (smog) উৎপন্ন হয়, তা এক বছরে যানবাহন কর্তৃক উৎপন্ন ধোঁয়ার সমান! আতশবাজি পুড়ানো হলে এর মধ্যে থাকা ধাতব লবণগুলো পুড়ে অন্য যৌগ তৈরি করলেও, কিছু কিছু ধাতব মৌল বাতাস, পানি ও মাটিকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে জুন-জুলাই মাসে 4th of July কে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একদল গবেষক দেখিয়েছেন যে, এই সময় প্রচুর পরিমাণে আতশবাজি পোড়ানোর ফলস্বরূপ বাতাসে particulate matter বা বস্তুকণার পরিমাণ বেড়ে যায়। ডয়েচ ভ্যালির আরেকটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৬ সালে শুধুমাত্র জার্মানিতে আতশবাজি পুড়ানোর ফলে ৫,০০০ টন বস্তুকণা নিঃসৃত হয়, যা সারাবছর যানবাহন হতে নিঃসৃত বস্তুকণার ১৭%। [সূত্রঃ How harmful are fireworks, Deutche Welle, Dated: 29/12/2017] ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একদিন মাত্র আতশবাজি পুড়ালে পরিবেশ ও বায়ুমণ্ডলের আর কতটুকুই বা ক্ষতি হতে পারে? ২০১৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে ১ ঘণ্টা আতশবাজি পুড়ানোর ফলে বাতাসে উপস্থিত স্ট্রনশিয়ামের পরিমাণ ১২০ গুণ, ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ ২২ গুণ, ব্যারিয়ামের পরিমাণ ১২ গুণ, পটাসিয়ামের পরিমাণ ১১ গুণ এবং কপারের পরিমাণ ৬গুণ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে এই সকল ভারী ধাতব কণা বাতাসে ভেসে বা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে তাদের উৎপত্তিস্থল হতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে এবং বায়ু, পানি ও মাটি দূষণে ভূমিকা পালন করে। আতশবাজি পুড়িয়ে আমাদের ক্ষণিকের আনন্দের জন্য আমরা ফি বছর পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন করছি তা মোটেও ক্ষণস্থায়ী নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই পৃথিবীটা আমাদের সবার, এর ক্ষতিসাধন করলে ফল আমাদের সবাইকেই ভোগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। আতশবাজির রঙিন আলো আর শব্দের আড়ালে পড়ে গেছে বিপন্ন এক পরিবেশের ছবি। কিন্তু আলো আর শব্দ হারিয়ে গেলেও পরিবেশের যে বিপর্যয় সাধন হয় তা চিরস্থায়ী। ■

রসায়ন প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

গল্প

স্কুলে এলিয়েন

অলোক আচার্য

‘একটা মজা দেখবি?

‘কী?’

‘মিজান স্যার বলেছে আজ পড়া না হলে সবাইকে মারবে, ঠিক?’

ঠিক?

‘আজ দেখবি মিজান স্যার কাউকেই মারবে না। আমি মিজান স্যারের মাথার ভেতর ঢুকে বেত মারার বিষয়টি বের করে দেব।’

‘যাহ’।

কিন্তু সত্যি সত্যি সেদিন মিজান স্যার পড়া না হলেও কাউকে মারল না। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে ক্লাসে থাকলেন। মনে হলো কেউ মিজান স্যারকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তন্ময়ের কথা প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরে আর বিশ্বাস না করার উপায় থাকে না। এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা হলো! তবে এটা তো আর প্রথম ঘটনা না। এই তো কদিন আগেই রেজাল্ট কার্ড দিলো। সেখানে স্পষ্ট দেখা গেল তন্ময়

আবিরের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। সব বিষয়ে তন্ময় ফার্স্ট। আবিরের মন খারাপ। এটা তন্ময় বুঝে গেল। বলল, ভাবিস না। ক্লাসের ফার্স্ট বয় তুই-ই থাকবি। তোর নম্বরই বেশি! পরদিন দেখা গেল তন্ময়ের নম্বরগুলো সব আবিরের হয়ে গেছে! আর আবিরের নম্বর তন্ময়ের। ঘটনা আরও আছে। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু টাইপের ছেলে ফরহাদকে এমন টাইট দিয়েছে যে এখন সে রীতিমতো ভেড়া হয়ে থাকে। আগে তো প্রায়ই আবিরের পেছনে লেগে থাকত। সেদিন ফরহাদ আবিরের বেঞ্চে চুইংগাম লাগিয়ে রেখেছিল। ক্লাস শুরু হয়েছে। ফরহাদ মিটমিট করে হাসছে। স্যার যখনই আবিরকে পড়া জিজ্ঞেস করবে তখন সে উঠে দাঁড়াতে গেলেই পেছনে চুইংগাম লেপটে বিচ্ছিরি অবস্থা হবে। কিন্তু যখন ফরহাদ দেখলো আবির উঠে দাঁড়ালেও পেছনে চুইংগাম লাগেনি। বরং কিছুক্ষণ পর যখন স্যার তাকে দাঁড় করাল তখনই ঘটল আসল ঘটনা। চুইংগাম ফরহাদের পেছনে এমনভাবে লেগেছে যে সে উঠে দাঁড়াতেই তার পেছনের বেঞ্চ থেকে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ওদিকে আবিরের পাশে বসে তন্ময় মুখ বুঁজে হাসছে। আবির বুঝতে পারল এটা তন্ময়ের কাজ। তন্ময় কি ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু জানে? তন্ময়ের কাছে বলতেই একদিন বলেছিল, সে কোনো জাদু জানে না। ওদের গ্রহের সবাই এসব জানে। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তবে কারও ক্ষতি করতে পারে না। এই গ্রহের ব্যাপারটা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি রকম চাপাবাজি মনে হয় আবিরের কাছে।

তন্ময়ের সাথে আবিরের পরিচয় অল্পদিনের। তন্ময় এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে জানুয়ারিতে। এই ক্লাসে আবিরের কেউ প্রতিযোগী ছিল না। সবাই আবিরকেই বেশি ভালোবাসতো। কোত্থেকে যে নতুন ছেলেটি চলে এল! ছেলেটি আসার পর থেকেই সবার মনোযোগ ওর দিকে চলে গেল। এ কারণেই ছেলেটার প্রতি আবিরের হিংসা হয়। অথচ নতুন ছেলেটা খুব ভালো। সবার সাথেই ওর বন্ধুত্ব। ক্লাসের যে সবচেয়ে দুষ্টু ফাহিম,তার সাথেও মিল। আবিরের যারা বন্ধু ছিল এতদিন তারাও এখন নতুন ছেলেটার আশেপাশেই থাকে। এটা আবিরের সহ্য হয় না। সেও তো দিনরাত পড়ালেখা করে কিন্তু ওর মতো পারে না। প্রথমে মাসিক পরীক্ষায় সে ক্লাসে ফার্স্ট হলো। স্যাররা সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জানুয়ারি মাসের এক সকালে ক্লাসে আসতে একটু দেরি হয়ে যায় আবিরের। ক্লাসে এসেই দেখে তার জায়গায় অপরিচিত একটি ছেলে বসে আছে। কোঁকড়ানো লালচে ধরনের চুল। চোখের মণিও লাল। গায়ের রং তামাটে ধরনের। ক্লাসে স্যার থাকায় সে কিছু না বলে পেছনে গিয়ে বসল। আগে কখনো এমন হয়নি। ওর জায়গায় কেউ বসেনি। আবির এই ক্লাসের ক্যাপটেন। ফলে সবাই আবিরকে একটু খাতির করত। কখন আবার কী নালিশ করে বসে!

সেদিন ক্লাস শেষে জানলো নতুন ভর্তি হওয়া ছেলেটার নাম তন্ময়। তন্ময় ওর দিকে হাত এগিয়ে দিলো। সেদিন থেকেই শুরু, তারপর আবিরের সাথে ছেলেটার বেশি একটা কথাবার্তা হয়নি। তন্ময় আবিরের সাথে কথা বলতে চেয়েছে। একসাথে বসতেও চেয়েছে। কিন্তু আবির ওকে এড়িয়ে গেছে। এটা তন্ময় বুঝেছে। তারপর থেকে ওরা ক্লাসে খুব একটা কথা বলতো না। তবে চোখাচোখি হতো। একবার ভাবে তন্ময়ের সাথে মিল হোক। আবার ভাবে শেষে আবার কী ভাববে! এভাবেই দিন কাটছিল।

স্যাররা ধরেই নিয়েছে এবার পরীক্ষায় আবিরের দুই রোল হবে। আর তন্ময় হবে প্রথম। শুধু স্যাররা কেন, ক্লাসের সবাই তাই জানে। আবিরও জানে। কিন্তু ওর কি-ই বা করার আছে। কেউ যদি ওর চেয়ে ভালো পরীক্ষা দেয় তাহলে তো ভালোই হওয়ার কথা। ওর এটা সহ্য হয় না। মোটেই না। কিন্তু দুজনের একদিন ঠিক মিল হয়ে গেল। সেটা বেশ আশ্চর্যের ঘটনা। সেদিন ক্লাসে আবিরের ইংরেজি পড়া হয়নি। এদিকে কোনোদিন ওর পড়া মিস হয় না। ইংরেজি স্যার যখন একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে তখন আবির ভয়ে, লজ্জায় এতটুকু হয়ে আছে। সেদিন আবার তন্ময় ওর পেছনেই বসেছিল। পেছন থেকেই সে খোঁচা মেরে বলল, কী রে তোর পড়া হয়নি? আবির বিরক্ত হলেও মাথা ঝাঁকায়। তোর খুব লজ্জা লাগছে? হু। এক কাজ কর। তোর ইংরেজি বইটার দিকে একবার মনোযোগ দিয়ে তাকা। দেখবি পড়া হয়ে গেছে। আবিরের তখন ভয়ে এমন অবস্থা যে কোনো কিছু ভাবার অবস্থা নেই। ব্যাগের ওপর রাখা ইংরেজি বইটার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকালো।

আশ্চর্য! আজকের পড়াটা যেন মাথার ভেতর ঢুকে গেল! এটা কীভাবে সম্ভব? এরপর আবিরের সাথে তন্ময়ের সম্পর্ক একটু ভালো হলো। তারপর একের পর এক তন্ময় আবিরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে লাগল। আর দুজনের বন্ধুত্বও গভীর হলো। এখন দুজন পাশাপাশি বসে। কেউ কাউকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারে না। এভাবে দেখতে দেখতে ডিসেম্বর এসে গেল। কদিন পরেই ফাইনাল রেজাল্ট দিবে। অনেকদিন তন্ময়ের সাথে দেখা হয় না। স্কুল বন্ধ। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ দুপুরে হঠাৎ আবিরের বাসায় তন্ময় এসে উপস্থিত। সে কোনোদিন তন্ময়কে ওর বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। আবির একটু অবাকই হলো। তন্ময় ওকে নিয়ে স্কুলের মাঠে গেল। তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

'তুই আমাকে এখানে আনলি কেন?'

'বলছি। শোন, এখন আমি যা বলব সেটা তুই হয়ত বিশ্বাস করবি না। কিন্তু সবটাই সত্যি। আর বিশ্বাস না করলেও কোনো সমস্যা নেই। আমি তো আর আসব না! আমি আগেও বলেছি আমার গ্রহের কথা। আমি আসলেই এই পৃথিবীর কেউ না। আমার গ্রহের নাম 'এক্স-২০০'। এখান থেকে একশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। আমাদের কোনো আকার নেই। ইচ্ছামতো যা কিছুই হতে পারি। এই যে এখন দেখছিস 'একটু পর আর থাকব না।'

'একটু পর তুই কী হবি?'

'একটু পর আমি আলোর ক্ষুদ্র কণা হবো। সেই কণায় আমি পৌঁছে যাব মহাশূন্যে। তারপর সেখান থেকে আলোর কণা ধরেই আমার গ্রহে পৌঁছে যাব। সন্ধ্যা করা যাবে না। সূর্যের আলো মিলিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। আমাকে এখানে পাঠনো হয়েছিল পৃথিবীর মত মানুষগুলো বন্ধু হিসেবে কেমন হয়, তাদের আচরণ, দুষ্টু বুদ্ধি, ভালোবাসা ইত্যাদি পরীক্ষা করতে। সেটা শেষ হয়েছে। আমার ফিরে যাওয়ার সংকেত এসেছে। এই দ্যাখ, আমার কপালের মাঝের অংশ নীল হয়ে উঠেছে।' আবির তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যিই ওর কপালের মাঝের অংশটা নীল হয়ে উঠেছে। তারপর হঠাৎ তাকিয়ে দেখে আবিরের পাশে কেউ নেই। তার পরিবর্তে ওর শরীর জুড়ে অদ্ভূত আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবির বুঝল সেটাই তন্ময়। তারপর আলোটা বিকেলের শেষ আলোর সাথে মিলিয়ে গেল। মনে মনে বলল, ভালো থাকিস বন্ধু। ■

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

জ্ঞানের আলো

বিচিত্র কুমার

আয়রে খোকা আয়রে খুকি
মানুষ হবে ভাই,
বই-কলম হাতে নিয়ে
পাঠশালাতে যাই।

বইয়ের পাতায় জ্ঞানের আলো
আমরা গ্রহণ করি,
বই আমাদের পরম বন্ধু
সুখের জীবন গড়ি।

দেশ-বিদেশের কত পড়া
আশার প্রদীপ ভাই,
জীবন হবে মধুর যদি
জ্ঞানের দেখা পাই।

কইরে খুকু

মাহমুদ রাজু

নতুন বছর এসে গেল
কইরে খুকুর দল
স্কুলেতে যাব মোরা
জলদি করে চল।

হাতে নিয়ে বইটি নতুন
মনে খুশির ঝড়
নতুন দিনে নতুন বইয়ে
বেশি বেশি পড়।

পড়ার মাঝে পাবে খুঁজে
নতুন দিনের সুখ
পড়ার মাঝে দাও বিলিয়ে
মনের যত দুখ।

দুখ বিলিয়ে সুখের মাঝে
নিজের জীবন গড়ো
ভালো মানুষ চাইলে হতে
পড়ার মতো পড়ো।

এক পায়ে এক ঠায়ে দাঁড়িয়ে

এস এম মুকুল

না ভূত, না মানুষ- দেখতে ডিম্বাকৃতির অদ্ভুত প্রাণী। যা দেখে ভয় পায় পাখি ও ফসলি জমির শত্রু ইঁদুর। বাতাসে এর একটু আধটু নড়াচড়া দেখলেই পাখিরা পালায়। রাতে তা দেখে ভয়ে গর্তে ঢুকে ইঁদুরের দল। এর নাম কাকতাড়ুয়া। নাম কাকতাড়ুয়া হলেও এটি শুধুমাত্র কাক তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। ফসলি জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়া পাখিদের তাড়াতে ব্যবহৃত এই অদ্ভুত বস্তুটি। গ্রামবাংলায় প্রকৃতির মায়াঘেরা গ্রামীণ জীবনের মূর্ত এক প্রতীকের নাম– কাকতাড়ুয়া। দূর থেকে দেখতে ঢোলাঢালা জোব্বা পরা, মুখে চুনকালি মাখা আর মাথায় কালো পাতিলের টুপি পরা কাকতাড়ুয়া এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাকতাড়ুয়া কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সৃজনী ঐতিহ্য হয়ে থাকবে কালে কালে। ক্ষেতের ফসলকে পাখি আর ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করার কৌশল হিসেবে এমন অদ্ভূত ও অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কার করেন কৃষকেরা। কারণ গ্রামীণ জীবনে দেখা গেছে কৃষকের ফসল নষ্ট করে পাখি আর ইঁদুর। পাখিরা দিনের বেলায় ক্ষয়ক্ষতি করলেও রাতের ফসল চোরের নাম ইঁদুর। কষ্টের

ফসলকে এদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হিসেবে এই কাকতাড়ুয়া ব্যবহার বা প্রচলন শুরু হয় বহু আগে থেকে। মানুষাকৃতির এই কাকতাড়ুয়া তৈরি করা হয় মূলত বাঁশ, মোটা কাঠি আর ছন বা খড়কুটো দিয়ে। দুই পাশে সোজা দুই হাত মাথা আর এক পায়ে দণ্ডায়মান মনুষ্যাকৃতির এই অদ্ভুত জিনিসটি এক পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

কাকতাড়ুয়া ব্যবহারের সুফল পেয়ে কৃষকরাও মহাখুশি। রাতের বেলায় ইঁদুর যখন ক্ষেতের শস্য কেটে গর্তে ঢোকাতে যায় তখন এই কাকতাড়ুয়া দেখে তারা ভয় পায়। তারা ভাবে মানুষ বা কিছু একটা তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। দিনের বেলায় পাখিরা এই অদ্ভূত জিনিসটি দেখতে পেয়ে সেই জমিতে আর নামতে সাহস পায় না। এমন বিশ্বাস থেকে গ্রামের কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে কাকতাড়ুয়ার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এর সুফলও পেয়েছেন কৃষকরা।

গ্রামবাংলার ফসলের ক্ষেতের অতি পরিচিত দৃশ্য এই কাকতাড়ুয়া। লম্বা খাড়া দণ্ডায়মান একটি খুঁটি এবং দুই বা তিন ফুট উপরে আড়াআড়ি অরেকটি খুঁটি বেঁধে তাতে ছন বা খড় পেঁচিয়ে মোটাসোটা করা হয়। তারপর আড়াআড়ি বাঁধানো অংশের সামান্য উপরে ছন বা খড়কুটো দিয়ে ডিম্বাকৃতি বা মাথার মতো বস্তু বানানো হয়। এরপর ব্যবহৃত পরিত্যক্ত ছেঁড়া জামা বা পাঞ্জাবি পরিয়ে দেওয়া হয় এটিকে। ডিম্বাকৃতির অংশটিকে ঢেকে দেওয়া হয় মাটির হাড়ি দিয়ে। সেই হাড়িতে চোখ-নাক-মুখ এঁকে দেওয়া হয় চুন বা চক দিয়ে। ফলে এক অদ্ভুত অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। যা দেখে ভয় পাওয়ার মতো একটা ব্যাপারও ঘটে। এই কাকতাড়ুয়াকে ফসলি জমির মাঝখানে দণ্ডায়মান করে রাখা হয়। অনেকের বিশ্বাস কাকতাড়ুয়া বাড়ন্ত ফসলের দিকে পথচারির কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

কালের প্রবাহে ফসল রক্ষার এই সনাতনী পদ্ধতিটি গ্রামবাংলার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠে আসে গল্প, কবিতা, নাটক, সিনেমায়। এরপর কাকতাড়ুয়া আধুনিক সমাজে পৌঁছে যায় শিল্পীর চিত্রকর্মে, বইয়ের প্রচ্ছদে। গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য হিসেবে কাকতাড়ুয়া হাজার বছর বেঁচে থাকুক আমাদের ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে। ■

উন্নয়ন গবেষক ও কলাম লেখক

মোহাম্মদ ইউসুফ
অষ্টম শ্রেণি
জুনিয়র এইড বাংলা ভার্সন স্কুল
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

বোতল বাগান

মৃত্যুঞ্জয় রায়

বন্ধুরা, একবার কল্পনা করো তো, তুমি যে টেবিলে বই পড়ছ তার উপরে একটা কাচের বোতলের মধ্যে কয়েকটা খুদে গাছ লাগানো আছে। ছোট্ট একটা বাগানের মতো সে গাছগুলো তোমার চোখের সামনে এক টুকরো প্রকৃতির জীবন্ত ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন লাগছে ভাবতে? হ্যাঁ তোমরা চাইলে একটা বোতলের ভেতরে এরকম একটা খুদে বাগান তৈরি করতে পারো। এটা একটা চমৎকার আইডিয়া!

ভাবছ, একটা বোতলের ভেতরে গাছ কীভাবে হবে? ছোট্ট ওই বোতলের মুখ দিয়ে গাছগুলো ভেতরে ঢুকাবো কেমন করে, আর সেগুলো বোতলের ভেতরে থাকবে কী করে? কী করে ওগুলো সেখানে লাগানো হবে, ওগুলোতে জলই বা দেবো কেমন করে? এমন অনেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই না? সব প্রশ্নের উত্তরই পেয়ে যাবে একটা বোতল বাগান তৈরি করতে পারলে। যখন দেখবে, বোতলের ভেতর লাগানো গাছগুলো ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে, তখন এসব চিন্তা মাথা থেকে সরে যাবে আর তুমি একটা বাগান করেই হাত পাকিয়ে ফেলবে। তাহলে এসো, আমরা বোতল বাগান করার কায়দাটা জেনে নিই।

বোতল বাগানটা আসলে কী? ছোটো মুখের পেটমোটা তলা চওড়া বোতলের মধ্যে কিছু গাছ লাগিয়ে বাগান করাটাই হলো বোতল বাগান। তবে বোতলে শুধু গাছ লাগিয়ে রাখাটাই বোতল বাগান না। বোতলের মধ্যে প্রকৃতির বাগানকে ছোটো

আকারে ধরে রাখাই হলো বোতল বাগান। এ ধরনের বাগানে বোতলের ভেতরে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কেবলমাত্র বাছাই করা কিছু সুনির্দিষ্ট গাছ লাগিয়ে তার পরিচর্যা করা হয়। একটা বোতলে বাগান করে তা অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যায়। বিশ্বে এমন একটা বোতল বাগানের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, যে বোতলটার মুখ ১৯৭২ সালে বন্ধ করা হয়েছে, ২০১৩ সাল পর্যন্ত সেটা সেভাবেই ছিল, ভেতরের গাছগুলো বেঁচেও ছিল। অবাক ব্যাপার সত্যিই। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো বোতল বাগান। যাদের বাগান করার শখ আছে, কিন্তু গাছ লাগানোর জায়গা নেই তারা এ ধরনের বাগান করে আনন্দ পেতে পারো। একবার এ বাগান করতে পারলে পরে আর তেমন যত্নের দরকার হয় না।

এখন এসো জেনে নেই, বোতলে বাগান কীভাবে করবে তোমরা। বোতলে বাগান করতে হলে একটি স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের পরিষ্কার বোতল নেবে। সেই বোতলের মুখ দিয়ে ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর ঢুকিয়ে বোতলের নিচে রাখবে। বোতলের মুখে একটি ফানেল রেখে তার সাহায্যে বোতলের ভেতরে নুড়ি পাথরের উপরে কম্পোস্টের গুঁড়ো ঢালবে। একটি শক্ত সরু কাঠি দিয়ে এসব কম্পোস্ট চেপে চেপে বসিয়ে দিতে হবে। তার উপরে ছড়িয়ে দেবে চারকোলের গুঁড়ো। এরপর সরু ও লম্বা চিমটার সাহায্যে একটি একটি করে ছোট্ট গাছের চারাগুলো বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দেবে। গাছগুলো লাগানোর পর বোতলের গা বেয়ে এমনভাবে পানি ঢালবে যাতে বোতলের তলায় থাকা নুড়ি পাথর ও কম্পোস্ট ভেজে, কিন্তু বেশি পানিতে ভেসে না যায়। পানি দেওয়া শেষ হলে বোতলের মুখ আটকে দিতে হবে। তবে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য হলেও বোতলের মুখ খুলে রাখতে হবে। বোতল বাগানে যে-কোনো গাছ লাগানো যাবে না। এর জন্য ছোটো থাকে এমন গাছ লাগাতে হবে। বোতলে লাগানোর মতো গাছগুলো হলো আইভিলতা, পিলিয়া ক্যাডরি (পিলিয়া), পলিপোডিয়াম (রক ক্যাপ ফার্ন), ম্যারান্টা, সেলাজিনেল্লা (ফার্ন), লিউকোনিউরা,

একটি পরিষ্কার বোতলে নুড়ি পাথর ভরবে

এরপর নুড়ি পাথরের উপরে ঢালবে কম্পোস্ট

লাগানোর মতো গাছ নেবে

বোতলের ভেতরে গাছ ঢুকিয়ে তলায় লাগাবে

ফাইকাস পুমিলা (লতা বট), অ্যাসপারাগাস প্লেক্সাস, বিগোনিয়া রেক্স (বিগোনিয়া), অ্যাগ্লাওনিমা কমুটেটাম (অ্যাগ্লাওনিমা), পাম, ফিলোডেনড্রন ইত্যাদি। কয়টা গাছ লাগাবে, সেটা নির্ভর করবে বোতলের মধ্যে কতটা জায়গা তুমি পাচ্ছ তার ওপরে। সোজাভাবে মাত্র দু-তিনটা গাছ লাগিয়েও বাগান করা যায়। বেশি গাছ লাগিয়ে জঙ্গল না করাই ভালো। বেশি গাছ লাগিয়ে একটি ছোট্ট বাগানের মিনিয়েচার করতে চাইলে বাসায় যদি পুরনো কোনো অ্যাকুরিয়ামের কাচবাক্স থাকে, সেটা নিতে পারো।

ঘরে পড়ে থাকা অ্যাকুরিয়ামকে সহজেই টেরারিয়াম তৈরির কাজে লাগানো যায়। টেরারিয়াম হলো ঘর সাজানোর এক আকর্ষণীয় উপাদান। এ ধরনের একটি টেরারিয়ামে অর্থাৎ কাচের অ্যাকুরিয়ামের তলদেশে মাটি ও নুড়ি পাথর বিছিয়ে তার ভেতরে লাগানো যায় আইভিলতা (ছোটো পাতাযুক্ত), সেলাজিনেল্লা (ফার্ন), ম্যারান্টা, পিলিয়া ও পেপারোমিয়া গাছ।

এ তো গেল বোতলের ভেতরে বাগান করার কথা। তুমি চাইলে বোতল কেটে সে বোতলকে ব্যবহার করে বোতলের বাইরেও বাগান করতে পারো। এর জন্য এক থেকে দেড়-দু'লিটার মাপের মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতলের চেয়ে সস্তা আর কোনো উপকরণ হয় না। বোতলের মাঝখান বরাবর লম্বালম্বিভাবে দুপাশ থেকে কেটে অর্ধেকটা তুলে ফেললে তার আকার অনেকটা নৌকার খোল বা বাথটাবের মতো হবে। এই খোলের মধ্যে জৈব সার মিশানো মাটি ভরে গাছ লাগিয়ে পানি দিলে সেসব গাছ বেঁচে যাবে।

বোতলগুলো পছন্দমতো সজ্জায় ঘরের বিভিন্ন স্থানে তোমরা সাজিয়ে রাখতে পারো। বারান্দায় এভাবে করা কিছু বোতল গ্রিলের সাথে বা ছাদের সাথে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে পারো। বোতলে সবচেয়ে ভালো হয় পর্তুলিকা বা টাইম ফুলের গাছ লাগানো। লাগাতে পারো ড্রেসিনা, পুদিনা, ধনিয়াপাতা, পিঁয়াজ, আইভিলতা, ছোটো মানিপ্ল্যান্ট, ভারবেনা, পিটুনিয়া, প্যানজি, ন্যাস্টারশিয়াম ইত্যাদি গাছ। বোতলের ভেতরে যেসব গাছ লাগিয়েছিলে সেসব গাছেরও কিছু গাছ এখানে লাগাতে পারো। শুধু যে এভাবেই কাটতে হবে এমন না- অনেকভাবে বোতলকে কেটে তোমরা তাতে গাছ লাগাতে পারো।

আবার একই আকারের কয়েকটা মিনারেল ওয়াটার বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে বা ব্যালকনির একপাশে একটা দেয়ালের সাথে চমৎকার একটা ফুলের ঝরনা বানিয়ে ফেলতে পারো। ভাবছ, সে আবার কী? হ্যাঁ, পর্তুলিকা ফুল দিয়ে তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো সুন্দর একটি ফুলের জলপ্রপাত বা ঝরনা। পর্তুলিকা ছাড়া ব্লু ডেজ ফুলগাছ দিয়েও এ কাজ করতে পারো। সেজন্য হয়ত আট-দশটা খালি মিনারেল ওয়াটারের বোতল লাগবে। এক লিটার মাপের বোতল হলে ভালো হয়, আধা লিটারের বোতল হলেও চলবে। বোতলগুলো মুখের ও পিছনের দিক কেটে ফেলবে। এরপর একটার পিছন দিক আর একটার মুখে ভরে জোড়ার জায়গায় ছিদ্র করে একটার সাথে আর একটা শক্ত করে বেঁধে দেবে। একেবারে শেষের বোতলটার তলাটা কাটবে না। এভাবে বোতলগুলো একটার সাথে আর একটা জোড়া দিয়ে লম্বা পাইপের মতো বানাবে। একে একটা ঝরনার পানি পড়ার প্রবাহের আকার দিতে একটা লোহার রডকে বাঁকাবে ও রডের সাথে পাইপের মতো জোড়ানো বোতলগুলো লম্বালম্বিভাবে বেঁধে দেবে। বোতলগুলোর গায়ে কিছুটা দূরে দূরে প্রায় এক সেন্টিমিটার আকারের ছিদ্র করবে। এরপর উপরের দিকে দেয়ালে একটি প্লাস্টিকের গামলা পাত্রের মাঝখানে ড্রিল করে দেওয়ালের সাথে মানানসই উচ্চতায় মজবুতভাবে আটকে দেবে।

উপর থেকে বোতলগুলোর মধ্যে জৈব সার মিশানো কোকোপিট বা আধাআধি পরিমাণে ভার্মিকম্পোস্ট মিশানো দোআঁশ মাটি ভরবে। গামলা পাত্রের নিচেও যতটা মাটি ধরে তা দেবে। ঝরনা আকারের বোতলগুলোকে গামলা পাত্রের নিচে দেওয়ালের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকে দেবে। বোতলের গায়ে থাকা ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে এক টুকরো করে পর্তুলিকা গাছ ভেতরে দিয়ে গেঁথে বা পুঁতে দেবে। এরপর বোতলের মাটি পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেবে। দেখবে কয়েকদিনের মধ্যেই গাছগুলো বেঁচে বাড়তে শুরু করবে। বাড়তে বাড়তে বোতল ঢেকে ফেলবে, ফুল ফুটবে অনেক। আর সেটাকে দেখতে ফুলের ঝরনার মতোই মনে হবে। এমন একটা ফুলের ঝরনা বানানোর জন্য তোমার দু-দিকে মাত্র দু ফুট করে জায়গা হলেই চলবে। ■

প্রাবন্ধিক

ব্যালকনিতে ফুল বাগান

গল্প

সুমন বনিক

স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অহনার মনের মধ্যে ছটফটানি,কখন সে ব্যালকনির ফুলের গাছগুলোতে পানি দিবে। সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মা পেছনে পেছনে ছুটছেন। 'আস্তে আস্তে পা ফেলো, পা পিছলে পড়ে যাবে, ব্যথা পাবে'। মায়ের কথাগুলো অহনা যেন শুনছেই না।

ঘরে ঢুকেই হন্তদন্ত হয়ে ব্যালকনিতে ছুটে এল। ফুল গাছগুলো যেন ক্ষুধার্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে! ইশ! তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, এতক্ষণ না খেয়ে আছো। অহনা বিড়বিড় করে বলছে আর ওদের কচি ডালে পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি তোমাদের খাবার দিচ্ছি। ফিসফিস করে কথাগুলো বলতে বলতে ওয়াশরুমে ঢুকল। ছোটো বালতিতে পানি এনে গাছের গোড়ায় গোড়ায়

পানি ঢালতে লাগল। অহনা অহনা বলে ডাকতে ডাকতে মা ব্যালকনিতে এলেন। 'এতক্ষণ ধরে এখানেই বসে আছো? খেতে এসো। ফুল গাছে পরে পানি দিও'। মায়ের চেঁচামেচি শুনে অহনা কিছু না বলে গাছগুলোতে পানি ঢালছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা অহনা ফুল গাছে পানি দেয়। বাবা মাঝেমধ্যে সারের ছোটো ছোটো প্যাকেট এনে দেন। মা নার্সারি থেকে নানান রঙের টব এনেছেন। আর অহনা তো ফুল গাছের সঙ্গে কথা না বলে থাকতেই পারে না!

সাতসকালে ডোরবেলের শব্দে অহনার ঘুম ভেঙে যায়। আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। ইচ্ছে ছিল অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে। কিন্তু ড্রয়িংরুমে ছোটোমামার গলা শুনে অহনা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। ড্রয়িংরুমে এসে মামাকে জড়িয়ে ধরে। এই দেখো তোমার জন্য ঢ্যাপের মোয়া, বিন্নিধানের খই, নারিকেলের নাড়ু এনেছি। ছোটোমামা বাড়ি থেকে প্রতিবার এরকম খাবার নিয়ে আসেন। বিকেলে তোমার সঙ্গে ঘুরতে যাব, এবার অনেকদিন থাকতে হবে। অহনার বায়না শুনে ছোটোমামা বললেন, 'নিশ্চয়ই বেড়াতে যাব, আমরা আইসক্রিম খাবো, পার্কে ঘুরব। এখন তুমি ফ্রেশ হয়ে, নাশতা সেরে পড়তে বসো'। ঠিক আছে ছোটোমামা, আমি যাচ্ছি । তুমিও রেস্ট নাও। একথা বলে অহনা ওর রুমে চলে গেল।

বিকেলের রোদ্দুর যেন গাছের মাথায় মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে! ছোটোমামা ও অহনা হাঁটতে হাঁটতে পার্কের বেঞ্চে এসে বসল। তখনও সন্ধ্যা নামেনি । গাছগুলো কী তরতাজা- সবুজ। ফুলগুলো মাথা তুলে যেন ওদের দেখছে। অহনা মামাকে বলল, 'আচ্ছা ছোটোমামা, পার্কের ফুলগাছগুলো এত সবুজ-সতেজ কেন? দেখো ফুলগুলো কী সুন্দর হাসছে! অথচ আমাদের ব্যালকনির ফুল বাগানে ফুল ফুটে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন মনমরা!'। অহনার কথা শুনে ছোটোমামা হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। দেখো পার্কের বৃক্ষ, ফুল গাছ পর্যাপ্ত আলো- বাতাস পায়; ওদের মাথার উপর আকাশ আছে, গাছগুলো রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে। তাই ওরা এত সতেজ, ফুলের মুখজুড়ে হাসি!' কথাগুলো বলে, মামা হাসলেন। আমিও তো ওদের পানি দিই,সার দিই। আদর- সোহাগ করি। অহনার কথা শুনে মামা হাসতে হাসতে বললেন, মনে করো, তোমাকে সারাদিন ঘরে আটকে রেখে অনেক খাবারদাবার দেওয়া হলো, তুমি কি হাসিখুশি থাকবে?' ছোটোমামার কথা শুনে অহনার মুখ ভার হয়ে গেল, চুপ করে থাকল। 'তুমি মন খারাপ করেছ কেন? তোমার বাগানের ফুলগুলো অনেক সুন্দর, কত রঙিন! ওদের হাসিও চমৎকার! এখন তুমিও একটু হাসো'। ছোটোমামার নরম স্বরের কথা শুনে অহনা হাসিমুখে বলল, 'চলো চলো বাসায় যাই। আমার গাছগুলোতে পানি দিতে হবে'। অহনার তাড়াহুড়ো দেখে, ছোটোমামা মুখ টিপে হেসে বললেন চলো যাই। ■

গল্পকার

এই ফুল এই পাখি

শেখ ফয়জুর রহমান

এই ফুল এই পাখি
ভালোবাসা মাখামাখি
সবুজের সমারোহে মিশে যায় মন।

প্রজাপতি পাখা নাড়ে
নাও বাঁধা সারে সারে
নদীটির পাড়ে দোলে ঘাসফুল, ছন।

বেলা হলে হাট জমে
রাত আসে থমথমে
ভিজে যায় কুয়াশায় ডালিমের ফুল।

সুবে হলে আলো আসে
সূর্যটা পুবে হাসে
সমীরণে বেণুবন, লতা খায় দুল।

গল্প

একটি বীজের গল্প

মোস্তাফিজুল হক

অনেকদিন আগের কথা। খড়কুটো আর শুকনো বীজ উড়িয়ে নিয়ে ঘূর্ণি বাতাস বইছিল। ঘূর্ণাবর্ত মরুভূমিতে চলে আসে। ঝড় মরুর বুকে এলে একটি বীজ বালিতে পড়ে যায়। সেই বীজের সাথে আরো অনেক বীজ ভেসে চলছিল। বীজটা মরুভূমিতেই অঙ্কুরিত হতে চেয়ে কঠিন শপথ করল। এই মরুতে এর আগে এমনটি ঘটেনি। তাই অন্যান্য বীজেরা বলল, 'এ অসম্ভব। তুমি এখানে অঙ্কুরিত হতে পারো না!' ওরা আরো বলল–

'চলে এসো প্রিয় তুমি–
কী করে তা ঘটে?
প্রাণহীন ধুলোতে কি
গাছ হয় বটে?
মরুতে কি চারা বাড়ে–
শুনেছে কে কবে?
এইখানে পড়ে থেকে
লাভ কিছু হবে?'

'আমি পারব, তোমরা শুধু দেখে যাও'– বীজটা বলল। কাউকে সে পাত্তা দিলো না। প্রবল আত্মবিশ্বাস আর উদ্যম নিয়ে নিজেকে রোপণ করল। বীজটা অঙ্কুরিত হয়ে সামান্য মাথা উঁচু করল। এরপর নিচের দিকে একটা মূল পাঠিয়ে দিলো। বায়ু বইতে থাকল। বালিও উড়তে থাকল। বালির ওপরে উঠে চারাও সবুজ হতে থাকল। মাথায় ডালপালা খুবই কম। নিচের দিকে শেকড় বাড়তে থাকল। অন্যান্য ঘূর্ণায়মান বীজেরা চিৎকার করে বলে চলল-

'এসব করা যায় কি বটে!
এর আগে কি এসব ঘটে?
বাঁচবে তুমি? বাঁচবে না–
বুদ্ধি কাজে আসবে না।'

অঙ্কুরিত চারা গাছটি লম্বা হতে শুরু করল। লম্বা থেকে আরও লম্বা হতে থাকল। এমনকি গাছে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বাড়তেই থাকল। চকচকে সোনালি বালি আর ঝকঝকে নীল আকাশ। এসবের বিপরীতে সগৌরবে বাড়তে লাগল। অন্যান্য বীজেরা ভীষণ অবাক হলো। তারা ঘুরতে ঘুরতে আবারও বলল–

'এসব করা যায় কি বটে!
এর আগে কি এসব ঘটে?
দেখবে তুমি পড়ে যাবে,
ঝড় এলে ফের ঝরে যাবে।'

অঙ্কুরিত বীজ বলল, 'আমি টিকে যাব। তোমরা শুধু দেখতে থাকো।'

বহু সময় পেরিয়ে গেল। গাছটা আরো বড়ো আর শক্তিশালী হলো। এমনকি ভীষণ শক্তিশালী। মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে শুরু করল। ওগুলোও খুব শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়ে আকাশমুখী হলো। বালির ভেতরে ছড়ালো ছোটো ছোটো শেকড়। তারপর খুব বেশিদিন নয়, আর অল্প কিছুদিন গেল। বড়ো গাছের চারপাশে বেশকিছু ছোটো ছোটো গাছ বাড়তে থাকল। সেসব গাছেরাও রস চায়।

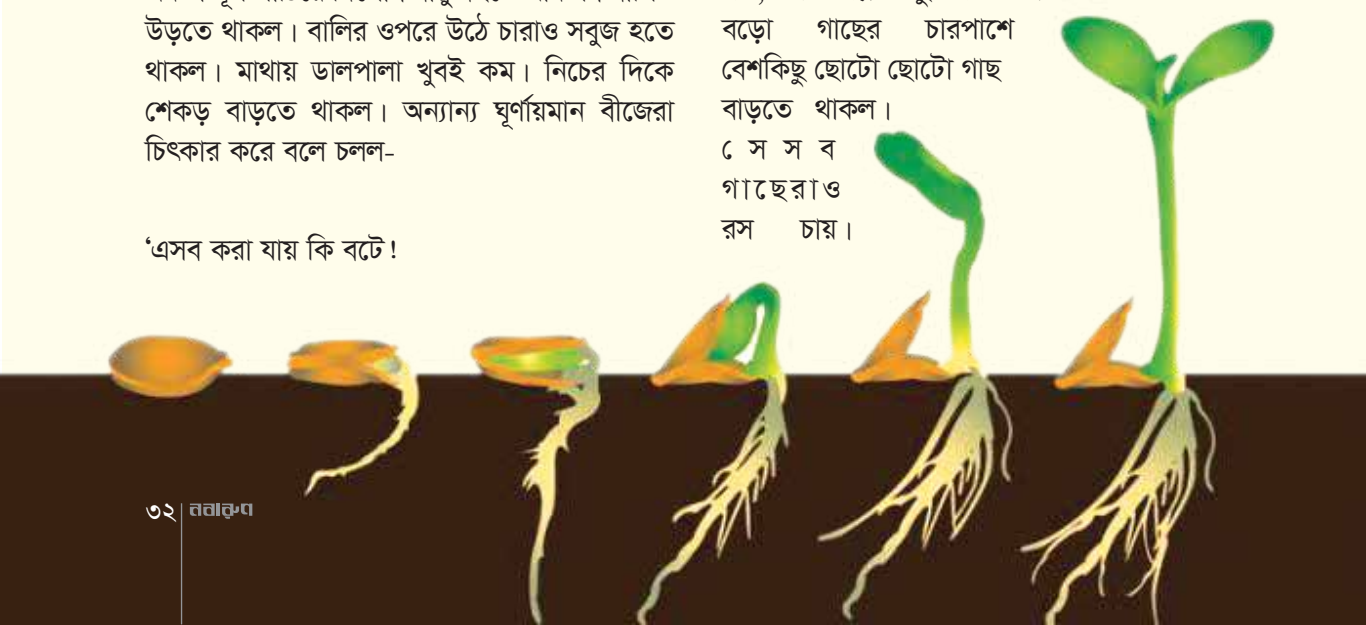

রসের খোঁজে শেকড় বালির গভীর থেকে গভীরে ঢুকে গেল। এতটা গভীরে গেল যে, মরুভূমির তলার জল শোষণ করতে শুরু করল। রস পেয়ে মরুর বালুকাময় পিঠ সিক্ত হলো। ঘাস গজিয়ে বালি ভেজা ভেজা হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা গাছ শক্তিশালী আর অনেক উঁচু হলো।

একসময় বাতাসে জলীয়বাষ্প বেড়ে গেল। মরুভূমিতে জলের বুদবুদ শুরু হলো। পানি জমে একটি দারুণ শীতল দিঘি তৈরি হলো। নতুন দিঘির খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ছোটো-বড়ো পাখি আর পোকামাকড়ও এ খবর পেয়ে গেল। ওরা সবাই সেই দারুণ জায়গাটা দেখতে এল। পাখিরা এখানে বসবাস করতে চায়। তাই ওরাও নানান রকমের বীজ বয়ে নিয়ে এল। তা থেকে অপূর্ব সব গাছ জন্মালো। সেসব গাছে ফুল ফুটল, ফুলের সুবাস ছড়ালো। পাখিরা সুরে সুরে গাইতেও লাগল।

একদল ক্লান্ত পথিক। মরুপথের যাত্রী। দূর থেকে তাদের নজরে এল সেই মায়াবী উদ্যান। তারা তাদের উটগুলো নিয়ে এলেন মরুদ্যানে। গাছের ছায়ায় বসে নিজেরাও বিশ্রাম নিলেন। বসন্তের বিশুদ্ধ জলে শীতলও হলেন। অল্প বিশ্রামে হারানো উদ্যমও ফিরে পেলেন। আবার তাদের যাত্রা শুরু হলো।

বিশ্রামের সময় কিছু বীজ যাত্রীদলের জামাকাপড়ে পড়েছিল। এঁটে থাকা ওসব বীজ হেঁটে যাবার সময় ঝরে গেল। বীজগুলো বালিকে আঁকড়ে ধরল। অঙ্কুরিত হয়ে চারাগাছও হলো। পরের বার পথিক এসব গাছের নিচে বসলেই ছায়া পাবে। অথচ অন্যান্য বীজেরা এই অঙ্কুরিত হওয়াকে একদমই অসম্ভব বলেছিল।

'হবে না, পারবে না' যারা বলে, তারা হেরে যায়। ভালো কাজের উদ্যোগ কাউকে না কাউকে নিতেই হয়। একদিনের ছোট্ট বীজ আজ মহীরুহ। এখন তার সুর করে বলতে ইচ্ছে করে–

সবচেয়ে বড়ো সত্য কথা
ধৈর্য থাকা চাই,
ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়ই
বাধার মূল্য নাই।
ধৈর্য এবং সাহস-গুণে
মরুও হয় তাজা,
সাহসীরাই দিগ্বিজয়ী
তারাই মহারাজা। ■

টীকা: একটি ইরানি লোককথা, রোজমেরি ফিলিপস, বার্বাডোস এর ইংরেজি কাহিনি অবলম্বনে বাংলা রূপান্তর ও পুনর্লিখন। ছড়াংশগুলো মোস্তাফিজুল হকের লেখা।

শিশুসাহিত্যিক

নিমন্ত্রণ

শেখ বিপ্লব হোসেন

শীতকন্যার পত্র পেয়ে হলুদ খামে,
সবুজ-শ্যামল মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি গ্রামে।
আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি,
পথের দুপাশ ফুল-ফসলের রংবাহারি।

খুব অদূরে হলদে ফুলের বইছে মেলা,
সেই মেলাতে প্রজাপতি করছে খেলা।
মন মাতানো ফুলের সুবাস হাওয়ায় ভেসে,
দেয় জুড়িয়ে পথিক হৃদয় ভালোবেসে।

শিস বাজিয়ে দূরের গাঁয়ে ট্রেন চলেছে,
নরম রোদে হিমকুয়াশার মন খুলেছে ।
থেকে থেকে হিমকুয়াশার বৃষ্টিনূপুর,
পথের বাঁকে ঝরতে থাকে সকাল-দুপুর।

ট্রেন চলেছে আপন মনে নিজের গাঁয়ে,
যমুনাটা যায় রেখে সে ডানে বায়ে।

নতুন আলো

আলমগীর কবির

পুব আকাশে ওই জেগেছে
নতুন আলোর রেখা,
শুরু হলো নতুন করে
নতুন স্বপ্ন দেখা।
নতুন বছর স্বপ্ন আনে
নতুন বছর আলো,
নতুন ভোরে আলোর বানে
দূর হয়ে যাক কালো।
নতুন ভোরে ফুল বাগানে
ফুল ফুটেছে কত,
খুশিগুলো মেলবে ডানা
প্রজাপতির মতো!
নতুন দিনের আকাশ জুড়ে
নতুন আশার ঘুড়ি,
হাওয়ার ডানায় নিয়ে যাবে
হয়ত স্বপ্নপুরী।

এল ঋতু শীতটা

রুমান হাফিজ

ভোরবেলা বেশ লাগে
কি দারুণ কেশ লাগে
এল বুঝি আজ ঋতু শীতটা
ঠান্ডা তো ইস লাগে!
হালকাতে বিষ লাগে
নড়চড় করে উঠে ভিতটা।

পুবের এই সূর্যটা
দেখে আসে তূর্যটা
তখনি তো দেয় গা এলিয়ে

আরো আসে দাদুটা
কোলে থাকা আদুটা
খিলখিল হাসে দাঁত মেলিয়ে।
গুড়ো করে চালকে
কেটে কুটে তালকে
হয় পিঠা রকমারি, স্বাদটা...!
একসাথে বসে আর
রূপ-গুণ যশে আর
ভেঙে যায় খুশির ঐ বাঁধটা।

এভাবেই দিন পার
সময়টা তিন পার
বিকেলটা আসছে যে ঘনিয়ে
গান আর গল্পতে
জমে ফের অল্পতে
মিলেমিশে গরিব আর ধনি এ!

কোথায় আমি আছি?

সাজিদা সুলতানা কথা

কোথায় আমি থাকি বলো
কোথায় আমি আছি
ধরো আমি মধুর চাকের
একখানা মৌমাছি।

পুতুল পুতুল খেলায় আমি
পুতুল হয়ে নাচি
ফুলটোক্কা খেলায় আমি
ফুল হয়ে আছি।

পঞ্চম শ্রেণি, জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মায়াজাল

সামিনা সারাহ

শীতের সকাল
কুয়াশার মায়াজাল
শিশির ভেজা ভোর
খুলে দিয়ে দোর
দূর্বা ঘাসে পা ডুবিয়ে
হারিয়ে যাই বহুদূর।
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি
মন যে নেয় কাড়ি।
মায়ের হাতের পিঠেপুলি
স্বাদে মন যায় ভুলি
সাথে গুড়ের পায়েস
শীতকালের আয়েশ

শীতের পাখি

মো. জামাল উদ্দিন

পাখিদের আকাশে কোনো সীমান্তরেখা নেই। তারা অনায়াসে উড়ে বেড়ায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে। প্রতিবছর শীতকাল এলেই জলাশয়, বিল, হাওড়, পুকুর ভরে যায় নানা রংবেরঙের নাম না জানা পাখিতে। আদর করে আমরা সেগুলোকে বলি অতিথি পাখি। নাম অতিথি হলেও এই পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে হাজির হয় নিজেদের জীবন বাঁচাতে। খাদ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে তারা। বিচিত্র তাদের সন্তান পালন, বাসা তৈরির কৌশল। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাতসহ প্রকৃতির হাজারও প্রতিকূলতা থেকে বাঁচতে তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে। এদেরকে আমরা পরিযায়ী পাখিও বলি।

প্রতি বছর দেশে শীত আসে আর শীতের সঙ্গে আসে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি। দূর দেশ থেকে আসে একটু আশ্রয় ও খাদ্যের আশায়। বিশেষ করে যেসব দেশে শীতের তীব্রতা খুব বেশি, খুব ঠান্ডায় যেখানে পাখিগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে; খাবার থাকে না। বাসা বাঁধার জায়গা থাকে না। সেসব দেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আমাদের দেশে চলে আসে। কোনো কোনো পাখির হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস উড়তে হয়।

কখনও কখনও এমন দূর দেশ থেকে ওরা আসে যে সেখান থেকে উড়ে আসতে আসতে পথে প্রায় তিন মাস সময় লেগে যায়। আবার কিছু দিন আমাদের দেশে থেকে আবার ফিরে যায়। ফিরে যেতেও আবার তিন মাস উড়তে হয়। তার মানে কোনো কোনো পাখির বছরে ছয় মাস শুধু উড়তে উড়তেই কেটে যায়।

পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি আছে। গবেষকরা এদের মধ্যে ১ হাজার ৮৫৫টি প্রজাতির পাখিকে পরিযায়ী পাখি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মানে মোট পাখির মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশ পাখি পরিযায়ী। প্রতি বছরই দুবার ওরা আমাদের দেশে আসে। এক তথ্যমতে, বাংলাদেশে মোট ৩১৬ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি প্রতি বছর আসে যার মধ্যে ২৯০ প্রজাতির পাখি আসে শীতে। অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বর থেকে ওদের আসা শুরু হয় আর চলে যায় মার্চে।

অর্থাৎ শীতে আসে বসন্তে বিদায়। এসব পরিযায়ী পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হাঁস, রাজহাঁস, কালেম, ডাহুক, ছোটো সরালি, খঞ্জনা, চটক, মাঠ চড়াই, কসাই পাখি, গাঙচিল, নীলশির, লালশির, কালো হাঁস, লেঞ্জা হাঁস, খুদে গাঙচিল, কুন্তিহাঁস, জিরিয়া, চখাচখি পাখি, বালিহাঁস, বড়ো সরালি, কালিবক, জলময়ূর, ডুবুরি, কোপাডুবুরি, ছোটো পানকৌড়ি, বড়ো পানকৌড়ি, কালো কুট, কাদা খোঁচা বা চ্যাগা, জালের কাদাখোঁচা, ছোটো জিরিয়া, বাটান, গঙ্গা কবুতর, রাজ সরালি, পিন্টেল, পাতি সরালি, সাদা বক, দলপিপি, পানমুরগি, কাস্তেচড়া, বেগুনি কালেম, পানকৌড়ি, ঈগল, পিয়াং হাঁস, ভূতিহাঁস, ধুল জিরিয়া ইত্যাদি।

পরিযায়ী পাখিগুলো প্রধানত আসে আমাদের উত্তরের দেশ থেকে। বিশেষ করে হিমালয়, নেপাল, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীনের জিনজিয়ান, ইউরোপ ইত্যাদি অঞ্চল যখন শীতের দাপটে বরফে ঢেকে যায় তখন সেখান থেকে পাখিগুলো উড়াল দেয়। ওরা জানে যে কখন ওদের কোন দেশে আশ্রয় নিতে হবে। এজন্য আসার আগে ওরা পাখার নিচে বেশি চর্বি জমা করে রাখে।

মাইলের পর মাইল ওরা উড়ে চলে সেই সঞ্চিত চর্বির শক্তিতে। ওদের পরিযায়ন স্বভাবটাও বেশ অদ্ভুত। সাধারণত ওরা দলবেধে চলে। যেখানে ওরা একবার আসে, সাধারণত সেসব জায়গাতেই পরের বছরগুলোতেও আসার চেষ্টা করে। তবে সবসময় একই পাখি হয়তো আসে না। তবে দলকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অবশ্যই পূর্ব অভিজ্ঞ পাখি থাকে যারা ওড়ার সময় ঝাঁকের সামনে থাকে ও পথের নির্দেশ দেয়।

ওদের দেহে অসাধারণ এক সংবেদ ও সাড়া প্রদান কৌশল আছে যা দিয়ে ওরা শত শত এমনকি হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ঠিকই আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে। যাত্রাপথের আকাশ, নক্ষত্র, পাহাড়, নদনদী, জলভূমি, অরণ্য ইত্যাদি ওরা চিনে রাখে এবং এসবের সাহায্যে ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যায়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া পাখিগুলো একটু উষ্ণতা, খাদ্য আর আশ্রয়ের আশায় আমাদের দেশের বিভিন্ন বনজঙ্গল, হাওর, বাঁওড়, খাল, নদী, চর, বিল, জলাশয়ে এসে জড়ো হয়।

ওদের রং-বেরঙের সৌন্দর্যে শীতের দিনে রঙিন হয়ে ওঠে আমাদের জলাশয়গুলো। সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর, বাইক্কার বিল, বরিশালের দুর্গাসাগর, ভোলার চরগুলো, পাবনার চলনবিল, সুন্দরবনের নদনদী ও খাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক ইত্যাদি স্থানগুলো যেন পর্যটনে আনে নতুন মাত্রা। এ দেশের পাখিপ্রেমীরা মেতে ওঠে পাখিশুমারি আর নতুন পাখি খোঁজার আনন্দে। ভাবতে অবাক লাগে, এ সময় পরিযায়ী পাখির ওপর লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে কিছু দুষ্টু মানুষের। পাখি শিকারির দল মেতে ওঠে পরিযায়ী পাখি শিকারে। দেশে আইন থাকলেও তারা তা উপেক্ষা করে শিকার করে।

শিকার করা পাখিগুলো সচরাচর হাটবাজারে দেখা যায়। আমারা অনেকেই সেসব পাখি কিনে মেতে উঠি পাখিভোজে। কী নৃশংসতা, কী অমানবিক! যে পাখিগুলো আমাদের কাছে এল একটু আশ্রয় ও উষ্ণতার আশায়, তাদের আমরা নিরাশ্রয় আর শীতলতা দিলাম। নিরীহ পাখিগুলোকে হত্যা করলাম! পাখির ছানাগুলোকে এতিম করে দিলাম!

জলবায়ু পরিবর্তনের বিড়ম্বনায় আতঙ্কিত ভুক্তভোগী দেশগুলো। তাপমাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে ঋতুবৈচিত্র্য। ঠিক সময়ে ফুল ফুটছে না। পাখির প্রজননক্রিয়া বিঘ্ন হচ্ছে। আগে যেসব দেশে যতটা শীত থাকত, এখন সেখানে কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠায় অনেক পরিযায়ী পাখির পরিযায়নকালীন আবাসস্থল পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আমাদের দেশেও জলাশয়ের পরিধি সংকুচিত হচ্ছে।

জলাশয়ে থাকা মাছ-শামুক ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। ফলে যে নিশ্চিত খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় পরিযায়ী পাখিগুলো আমাদের দেশে আসত, ওরা এসে আর সেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের সঙ্গে আমাদের আঘাত পরিযায়ী পাখিগুলোকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে। বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও শীতের শুরু থেকেই সাইবেরিয়াসহ শীতপ্রধান বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করে। প্রতিবারই তারা নতুন ও নিরাপদ জায়গার সন্ধান করে। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, শাহজাদপুর ও তাড়াশের চলনবিল অঞ্চলেও দেখা মিলছে পরিযায়ী পাখির। বিলের পানিতে দেখা মিলছে বালিহাঁস, পানকৌড়ি, সাদা বক ও ধুসর বকসহ বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি। দূরদূরান্ত থেকে এসব পাখি দেখতে ছুটে আসছেন পাখি প্রেমিরা।

পাখিকে বলা হয় প্রকৃতির অলঙ্কার। পাখি পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। পাখির বিষ্ঠা থেকে ফসলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মোটকথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পাখির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বন্ধুরা, এসো আমরা সবাই পাখির বন্ধু হই। পরিযায়ী পাখির আগমনকে স্বাগত জানাই, দেখভাল করি। যেন আগামী শীতে ওরা আবার ফিরে আসতে পারে আমাদের দেশে। ■

ছন্দে ছন্দে রং বদল

আরাফাত রহমান

পৃথিবীর বুকে রয়েছে জানা-অজানা হাজারো কত বিস্ময়কর প্রাণী। এদের কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কিছু দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। কালে -ভদ্রে দেখা মেলে এসব বিস্ময়কর প্রাণীর। যার সৌন্দর্য্যে আর বিশেষত্বে মুগ্ধ হই আমরা। প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হচ্ছে বা সন্ধান মিলছে। যদিও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিলুপ্ত হচ্ছে প্রাণী প্রজাতিরও। বিশ্বে এখন পর্যন্ত মোট কতটি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাকি ৯৯.৯৯৯ শতাংশ এখনো আবিষ্কৃতই হয়নি!

অনাবিষ্কৃত নানা প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে বিচিত্র পাখির সংখ্যা নেহাতই কম নয় । প্রতিটি পাখিই অপরূপ শিল্পশৈলীর এক একটি নিদর্শন। কিন্তু তার মাঝেও এমন কিছু পাখি আছে, যারা নিজেরাই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তৈরি করে। কখনো গায়ের বাহারি রঙে, কখনো রাজকীয় ঝুঁটিতে, কখনো মনোহর লেজে, প্রকৃতির সৃষ্টি প্রকাশ করে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক অদ্ভুত পাখির ভিডিও ভাইরাল হয়। পাখির চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হন নেটিজনরা । ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি নিজের আঙুলে নিয়ে রেখেছে ছোট্ট এক পাখি। আঙুলে বসেই পাখিটি মাথা নাড়াচ্ছে। তখনই পাখিটির রং বদলে কমলা-গোলাপি হচ্ছে, আবার বেগুনি-গোলাপি রঙে পালটে যাচ্ছে। যা সত্যিই মুগ্ধকর। খুদে এই পাখিটির দিকে তাকিয়ে যে রং আমরা দেখব পরক্ষণেই সেই রং দেখতে পাবো না, চোখের পলকে দেখবে ভিন্ন আরেক রং। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে চাইব না। বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি!। গল্পকথা নয়, বাস্তবেই এমন পাখির উপস্থিতি রয়েছে। যার দেখা মেলে নর্থ আমেরিকায়। রং বদলে নেওয়া গিরগিটির নাম আমরা সকলে জানলেও পাখি প্রজাতির মধ্যে এমন ঘটনা বিরল।

রং বদলে নেওয়া অপরূপ এই সুন্দর পাখির নাম 'সুরাকাভ'। আকারে ছোট্ট, কিন্তু দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। পাখিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানান, অপূর্ব উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় পালকের অধিকারী হয় আশ্চর্য এই পাখি। যে প্রতিবার মাথা ঘুরালেই বদলে নিতে পারে নিজের রং। হামিংবার্ড গোত্রের পুরুষ এই পাখিটির অদ্ভুত রকমের পালক রয়েছে। একই সময় দুই তিনজন মিলে পাখিটিকে দেখলেও একেক জনের কাছে পাখিটির একেক রকম রং মনে হবে। পাখিটা মাথা ঘোরানোর সাথে সাথে কিংবা শরীরের পালক নাড়ানোর সাথে সাথে বদলে যায় এর রং। এ যেন চোখের ধাঁধা! কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। পালকের উপরের দিকে কেরাটিন নামক বিশেষ ধরনের পাতলা প্রোটিনের পরিষ্কার স্তর রয়েছে। এই পরিষ্কার স্তরের উপর সূর্যালোক পড়ার পর কিছু আলো প্রতিফলিত হয়, কিছু আলো পালকের মধ্যে প্রবেশ করে আর কিছু আলো পরবর্তী স্তরের ওপর গিয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে এই আলোর সমষ্টি বিভিন্ন রকমের রং তৈরি করে। তবে এটি অনেকটাই নির্ভর করে আমরা কোন অবস্থান থেকে এই আলোর সমষ্টিকে দেখছি। একই আলোর সমষ্টিকে একেক অবস্থান থেকে একেক রকম রঙের অনুভূতি তৈরি করে। বিশেষজ্ঞ এন্ড্রুলিচ সুরাকাভের রং বদলানোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে ক্যামেরা রেখে ক্যামেরার চোখে পাখিটিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনটি অবস্থানে রাখা তিনটি ক্যামেরায় জায়গা থেকে পাখিটিকে সবুজ মনে হয়েছে, আরেক জায়গা থেকে নীল মনে হয়েছে আবার অন্য জায়গা থেকে মনে হয় গাঢ় বেগুনি। চোখও একইভাবে কাজ করে। তাই একেক জায়গা থেকে পাখির রং একেক রকম মনে হয়। আবার একই জায়গা থেকে দেখলেও পাখিটি যদি নিজের অবস্থান সামান্য পরিমাণও বদলায় তাহলে রং বদলে যায়। কি অদ্ভুদ এই বিচিত্র প্রাণিজগত তাই না বন্ধুরা ■

প্রাবন্ধিক

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

পরিযায়ী পাখির আবাসস্থলকে নিরাপদ রাখা ও পাখিদের বিচরণস্থল সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতি বছর মে ও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস (World Migratory Bird Day) পালিত হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমান বিশ্বের জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পাখিদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে পরিযায়ী পাখিরা মারাত্মক খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়।

পরিযায়ী পাখিদের সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে ২০০৬ সাল থেকে এই দিবস পালন শুরু করা হয়। পরিযায়ী পাখিদেরকে আগে অতিথি পাখি বলা হতো। গবেষণায় দেখা গেছে যে এরা অতিথি নয়। বরং যে দেশে যায় সেখানে তারা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের হওয়া পর্যন্ত বাস করে। অর্থাৎ বছরের বেশ কয়েক মাস তারা ভিন দেশে বাস করে। বরং তারা নিজ দেশে বাস করে স্বল্প সময়ের জন্য।

সাধারণত হেমন্তের শুরুতে বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি আসার মওসুম শুরু হয়। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) বলছে, প্রত্যেক বছর বাংলাদেশের স্বাদু পানির বিল এবং জলাশয়গুলোতে দুই লাখেরও বেশি হাঁস এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিচরণ করে। আমরা জেনে না জেনে নানাভাবেই ক্ষতি করি এসব পাখিদের। আইন থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই মানি না । শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ করলেই কেবল পরিযায়ী পাখি এবং তাদের আবাসস্থল রক্ষা করা সম্ভব না, সেই সঙ্গে প্রয়োজন জনসচেতনতা। ■

প্রতিবেদন: মিরাজ রহমান

গল্প

বিড়ালের ছানা

মোহাম্মদ ইসমাইল

বাড়ির সামনের ডাস্টবিন থেকে দুটো বিড়ালের বাচ্চা তুলে আনল আমার ছোটো ভাই হাফিজ। বাচ্চা দুটোর অবস্থা ভালো না। জীর্ণ, শীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন শরীর। খিদে আর মায়ের মমতা হারিয়ে সারাদিন মিউমিউ করতে লাগল ওরা। বাচ্চা দুটো এত ছোটো যে খেতেও পারে না নিজেরা। মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স হয়নি ওদের।

ওদেরকে বাঁচাতে হলে চাই অনেক নার্সিং। নার্সিং ছাড়া ওরা বাঁচবে না।

মা বলল, বাচ্চা দুটোকে ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে ওদের মা?

সত্যিই তাই। মা বিড়ালটার কোনো খোঁজ-খবর নেই। সে লাপাত্তা। তাই বলে তো বসে থাকা যায় না। আমার ছোটো ভাই আর মা শুরু করল ওদের সেবা-যত্ন। আমাদের গাভী আছে। গাভীর দুধ পরিবারের সবাই খাই। গরুর দুধ জাল দিয়ে ঠান্ডা করা তারপর সেই দুধ বাটিতে করে এনে চামচ দিয়ে ওদের মুখে তুলে খাওয়ানো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাচ্চা দুটো হাঁ পর্যন্ত করতে চায় না।

মা জোর করে হাঁ করায় আর ছোটো ভাই মুখে তুলে দেয় চামচ। খেতে ওদের অনেক কষ্ট হয়। কারণ ওরা অনেক দিন না খেয়ে শুকিয়ে গেছে। তরল দুধ চুক চুক করে খায়। ব্যাস পেট ভরে যায়। আর মিউমিউ করে না। এভাবে চলল কয়েক দিন।

জীবের প্রতি সবার দয়া করা উত্তম কাজ বা এবাদত। এই জন্য আমার মা ও ছোটো ভাই মিলে ওদের সেবা করতে লাগল।

মাকে হারিয়েও আমাদের মায়ের স্নেহ মমতা পেয়ে একটু একটু করে সবল হতে লাগল। এখন ওরা নিজেরাই খায়। বিড়ালের বাচ্চা দুটো এখন থাকে আমাদের বাড়িতেই।

গভীর এক মমতায় জড়িয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে, বোধ হয় মনে করে আমরা ওদের ভাই।

আমাদের সবাই আদর করে। ওরা আমাদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যায় না। ■

গল্পকার

গল্প

ব্যাঙ ও পুঁটি মাছের গল্প

তারিকুল ইসলাম সুমন

খাদ্য গুদামের পাশে ফায়ার পয়েন্টে রাখা আগুন নেভানোর নানান দ্রব্য। আছে বিশাল এক পানির হাউজ। ওটাকে এখন চৌবাচ্চা বলা যায়। ইট, বালু সিমেন্টে গাঁথা পাকা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার পানিতে প্রায়ই লাল শাপলা ফুটে থাকে। শাপলার পাতা পাটির মতো বিছানো থাকে পানির উপর।

স্বচ্ছ পানিতে খেলা করে কয়েকটি পুঁটিমাছ। মাছগুলো খুব আনন্দে সাঁতার কাটে। চৌবাচ্চার দেয়ালে থাকা শ্যাওলা ঠুকে ঠুকে খায়। রোজ বিকেলে একজন মাসি এসে ভাসমান খাবার দিয়ে যায় তেলাপিয়ার জন্য। ওখান থেকেও খাবার পায় ওরা। এভাবেই বড়ো হচ্ছে পুঁটি মাছগুলো।

চৌবাচ্চার পানিতে মাছেদের সাথে বাস করে এক ব্যাঙ দম্পতি। খুব মিলেমিশে থাকে ওরা। একে অপরের ভালো বন্ধু, কখনো ঝগড়াঝাটি হয় না কারো সাথে। বিপদে আপদেও একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই তো সেদিনের কথা, চৌবাচ্চার কোনা দিয়ে ঝপাৎ করে পড়ল এক হলুদ ঢোঁড়া সাপ। একে অপরকে সতর্ক করল তখনই। পানিতে ভেসে থাকা ব্যাঙকেও এসে খবর দিলো এক পুঁটি। বলল– ব্যাঙ ভাই, ব্যাঙ ভাই দ্রুত পালাও, ঢোঁড়া সাপ আসছে এদিকে। সবাই ডুবে ছুটে পালালো নিরাপদে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। বর্ষায় মায়ের পেট থেকে ফোটা পুঁটির পোনাগুলো ছুটতে শিখেছে। পিলপিল করে ছুটে বেড়ায়। চৌবাচ্চার দেয়াল ঠুকে ঠুকে শেওলা খাবার খায়। খুব নাদুসনুদুস

চেহারা হয়ে উঠেছে পুঁটিদের পোনাগুলার।

ব্যাঙ দম্পতিরও কয়েকটি ছানা হয়েছিল। মারা গিয়ে এখন মাত্র দুটি বেঁচে আছে। ব্যাঙ ছানা দুটিও বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। পুঁটির পোনাদের সাথে খুব ভাব ওদের। একসাথে গল্প করে, ছুটে, পাল্লা দেয়। শাপলা গাছের আশপাশেই থাকে ওরা।

হেমন্ত পেরিয়ে শীতের শুরু। একদিন ব্যাঙ ছানাদের খুঁজতে বেরিয়েছে পুঁটির পোনাগুলো। খেলার সময় হয়েছে এখনো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! আজকাল মাঝেমধ্যেই এমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ওরা দুই ভাই। আবার ছড়া কাটতেও শোনা যায় ওদের মুখে। গতকালই ছড়া কাটছিল ওদের এক ভাই,

ব্যাঙের ছানা আমরা দু'ভাই
ইচ্ছে হলেই ডাঙাতে যাই
বেড়াই হেসেখেলে,
আমরা হলাম
মায়ের ভালো ছেলে।

ছুটতে ছুটতে দুই ভাই যখন এদিকে আসছিল তখনই দেখা হলো পুঁটির এক পোনার সাথে। পুঁটির পোনা মুখ গোল করে জানতে চাইল,

-কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

-ডাঙায় গিয়েছিলাম।

-ডাঙা! ডাঙা আবার কী?

-আহ্, তোমরা জানো না? পানির উপরে। শীতের দিনে আজকাল রোদ না পোহালে ভালো লাগে না।

-ও, তাই?

অবাক হয়ে চলে গেল পুঁটির পোনা। ব্যাঙের আরেক ছানা এবার ছড়া কাটতে শুরু করল,

তোমরা হলে মাছের ছেলে থাকো জলে জলে
আমরা যত ব্যাঙেরা সব থাকি জলে-স্থলে।

পুঁটি পোনাদের মাঝে এবার গুনগুন শুরু হলো। অনেকে খেয়াল করে দেখতে লাগল ব্যাঙের ছানারা কোথায় যায়, কি করে। একবার মুখ উঁচিয়ে দেখল এক পুঁটি পোনা। শাপলা পাতার উপর বসে চোখ বুজে আরামে রোদ পোহাচ্ছে ব্যাঙের ছানা। একটু পর লাফিয়ে পানিতে নামল আবারো এক লাফে পাতায় গিয়ে বসল। বাহ্, কী মজা! এভাবেই লাফ দিয়ে দিয়ে ওরা পাড়ে ওঠে? ডাঙায়ও যায়! কী আছে ডাঙায়?

পুঁটি পোনারা লাফাতে শুরু করল। এদিকে লাফ দেয়, ওদিকে লাফ দেয়। একটি পুঁটির পোনা সাত সকালেই এক লাফে শাপলা পাতার উপর গিয়ে পড়ল। পানি থেকে উপরে উঠতেই পুঁটির চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেক লাফে আবার পানিতে পড়ল সে। প্রাণে বাঁচল যেন ঐ পুঁটি পোনা।

একটু আগেই লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠেছে ব্যাঙেরা দুই ভাই। এটা দেখেই চৌবাচ্চার এক পাশে ঘুরঘুর করছে কয়েকটি পুঁটির পোনা। ওদেরও লাফিয়ে উপরে ওঠার শখ হয়েছে। এবার একসাথে ভীষণ জোরে লাফিয়ে উপরে উঠল দুটি পুঁটি পোনা। পানি ছেড়ে উপরে উঠতেই ঘটল ভীষণ বিপদ। প্রাণ একেবারে যায় যায় অবস্থা। নিথর হয়ে আসছিল দেহ। সূর্যের রোদে চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

পুঁটিদের চিৎকারে ছুটে এল ব্যাঙেরা দুই ভাই। নিজেদের মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে আবারো পানিতে ফেলল তারা। মৃতের মতো পানিতে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর পাখনা নাড়িয়ে আবারও সাঁতার কাটতে পারল। অন্য পোনাদের সাথে দ্রুত ছুটে এল পুঁটির বাবা-মা। ইশ! ছানা দুটি আজ মরতে বসেছিল!

চিৎকার-চেচামেচি ও কান্নার আওয়াজ শুনে ওখানে এক জ্ঞানী কইমাছ এসেছিল। পাখনা দিয়ে আদর করে অনেক বোঝালো– শোনো বাবারা, পরিণাম না ভেবে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নেই, বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঝুঁকি থাকা কাজে অবশ্যই বড়োদের পরামর্শ নেয়া উচিত। ■

শিশুসাহিত্যিক

পুতুল বিয়ে

সুয়াইব মোহাম্মদ নাহিদ

খোকন দিবে পুতুল বিয়ে
ভাবছে বসে একা
স্বজন সাথি আসবে বাড়ি
পাবে সবার দেখা।

সাজবে দেহ নতুন রূপে
হাতে রেশমি চুড়ি
ঝুমুর ঝুমুর পায়ে নূপুর
লাগবে পাকা বুড়ি।

জামাই আসবে টোপর মাথায়
মিষ্টি মালাই নিয়ে
খোকন যাবে বিয়ে বাড়ি
কদম তলা দিয়ে।

স্বপ্ন আমার

দেলওয়ার বিন রশিদ

স্বপ্ন আমার সবুজ বাগে
ফোটা ফুলের হাসি
স্বপ্ন আমার সুখ ছোঁয়া
কলাপাতার বাঁশি।

স্বপ্ন আমার গল্প ছড়া
নতুন বইয়ের পাতা
স্বপ্ন আমার রং ও তুলি
ছবি আঁকার খাতা।

স্বপ্ন আমার সজনে ডালে
একটা দোয়েল পাখি
স্বপ্ন আমার দুর্বা ঘাসে
রোদের মাখামাখি ।

স্বপ্ন আমার পতাকায় ওই-
সবুজের মাঝে লাল
স্বপ্ন আমার স্বদেশ জুড়ে
বাঁচে চিরকাল।

ঘোড়া

মো. জাহিদুল ইসলাম

টগবগিয়ে টাট্টু ঘোড়া ছুটল দূরের দেশে
খুরে ঘায়ে রাঙা ধুলো সাজল মেঘের বেশে
চুলগুলো তার ঘাড়ের উপর লাফায় ব্যাঙের মতো
লেজখানিও লাফায় দারুণ পা ফেলে সে যত

ভয় পেলে সে দু'পা তুলে খকখকিয়ে কাশে
তাই না দেখে গাছের ডালে বানর কতক হাসে।

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর দ্বাদশ পর্ব-দ্বিতীয় অংশ]

আমি এবার বুলুর ওপর একটু বিরক্ত হই। তবুও মাথা ঠান্ডা রেখে বলি– বুলু, তুমি নতুন। যুদ্ধের নিয়ম-কানুন কিছুই জানো না। সাইদ সাহেব তোমাকে যা বলেছেন, তা আমার মানে কমান্ডারেরই কথা। যুদ্ধের সময় কমান্ডারের কথার ওপর কোনো কথা বলা চলে না। এটা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু তুমি আজই এসেছো বলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেবো না, তবে বিষয়টার একটা ব্যাখ্যা দেবো। শোনো, দেশের এই দুর্দিনে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আবেগের কোনো জায়গা নেই। তুমি রাজাকার ক্যাম্পের সব খবর পেতে গেলে তোমাকে ওদের সাথেই ক্যাম্পে থাকতে হবে। ওদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে। শুধু কাঠ চেরাইয়ের কাজ নিলে তো তুমি ক্যাম্পে থাকতে পারবে না। এতে আমাদের আসল লক্ষ্যই হাসিল হবে না। আর রাজাকার হওয়ার ভয় পাচ্ছো? তোমার এ অনুভূতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তবে মনে রাখবে, বড়ো কিছু করতে গেলে অনেক বড়ো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তুমি শুধু রাজাকারের অভিনয় করবে, এই তো! আসল রাজাকার তো হবে না! আমাদের কাছে তুমি এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশের মানুষও একদিন সে-কথা জানবে। ঠিক আছে?

বুলু মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে– জি ছার। সব ঠিক আছে। আশা করি সব ঠিক থাকবে।

আমি খুব খুশি হই বুলুর কথায়। তারপর বলি: সাদেক ভাই, বুলুকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমাদের আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে। আরও কিছু জরুরি কথা আছে।

ওরা চলে আসে। সাদেক বুলুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজেও বাড়ি যায়।

নিজের ঘরে এসে বুলু শুয়ে পড়ে। কিন্তু চোখে তো ঘুম আসে না। মনের মধ্যে এক ঝাঁক খুশির প্রজাপতি শুধু নাচে আর গান গায়। সে ভাবে: গরিব কাঠুরিয়া বুলু, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে গেল একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাবু ভাই তাকে কত বড়ো একটা দায়িত্ব দিয়ে দিলেন! আহ! দেশের জন্য কাজ করার মধ্যে কত সুখ, তা আগে জানা ছিল না।–এসব ভাবতে ভাবতে বুলু একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

বুলু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে– ও রাজাকারদের কাঠ চেরাইয়ের কাজ করছে। নির্জন আমবাগানে আর কোনো মানুষ নেই। হঠাৎ দেখতে পায় একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটার চোখ দুটো ট্যারা। মুখে শয়তানের হাসি। সে বুলুর কাছে এসে বলে, আমি এই রাজাকার ক্যাম্পের কমান্ডার মৌলবী বজলু মিয়া। তুমারে তো আমিই পরথম পছন্দ করিছিলাম। তা কাজ করো, কাজ করো। তবে এই কষ্টের কাজ বেশি দিন কত্তি হবে না তুমার। মাশাল্লা যে ফিগার তুমার! তুমার হাতে কুড়াল না, রাইফেলই বেশি মানায়। কাঠ চেরাই করার চাইতে মুক্তিগের গুলি করে মারা বেশি সম্মানের, আবার মজারও। এক-এক জন মুক্তি গুলি করে মারবা, আর সাথে সাথে তুমার দাম যেমন বাইড়ে যাবে, তেমনি ছওয়াবও হবে বেশুমার। আমি আরেকজন ভালো কাঠুরিয়া জোগাড় কত্তি পাল্লিই তুমার হাতে রাইফেল তুলে দেবো। তহন তুমি খাস রাজাকার মুজাহিদ হয়ে যাবা।

রাজাকার কমান্ডারের কথায় দিলুর মাথায় খুন চড়ে যায়: কয় কী নেমকহারাম! বাঙালি হয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাগের গুলি করে মারার কথা কয়! আবার কয় ছওয়াব হবেনে! শোন্ নেমকহারাম, এই হারাম কাজে ছওয়াব হবে না– আকাশ-সুমান গুনা হবে, খালি গুনা! বুলু আর নিজেকে সামলাতে পারে না। স্বপ্নের মধ্যেই হাতের ধারালো কুড়ালটা ধাঁই করে মারে কমান্ডারের মাথা বরাবর। কমান্ডার ভীষণ এক চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর সেই মরণ-চিৎকারে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে বুলু। তার সারা শরীর তখনো কাঁপছে থরথর করে।

বুলু তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ে। ঘুমের মধ্যে দেখা জ্বলজ্বলে স্বপ্নটা ওর খুবই ভালো লাগে। স্বপ্ন কী কখনো সত্যি হয়! কখনো কখনো হয় বৈ কী! এমন স্বপ্ন সত্যি করার জন্যই বাবু ভাই যে তাকে রাজাকার ক্যাম্পে কাঠ চেরাইয়ের কাজ নিতে বলেছেন, তা ওর কাছে স্পষ্ট হয়।

মা বুলুর ঘরে ঢুকে বলেন– বুলু, রাতে কনে গিছিলি বাপ? রাজাকার ক্যাম্পের ছলিম রাজাকার তোরে খুঁজতিছিল। কী হয়ছেরে বাজান? আমার তো বড়ো ভয় কত্তিছে।

এরই মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে বুলুর বাবাও এসে দাঁড়ান সেখানে। তাঁর মুখেও ভয় আর দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। তাঁরও প্রশ্ন রাজাকারেরা তোরে খোঁজে ক্যান বাজান!

বাবা-মায়ের ভয় ও দুশ্চিন্তা দেখে বুলু বলে– তুমরা কোনো চিন্তা করবা না। আমি কাঠুরে মানুষ। কাঠ কাইটে রান্নার খড়ি বানানোই আমার কাজ। এইডাই আমার পেশা। যারা টাকা দেবে, আমি তাগেরই কাঠ ফাঁইড়ে দেবো। এতে তো অসুবিধে নেই।

মা বলেন– তোর কতা আমি কিছুই বুজলাম না, বাজান। অন্য মানুষির কাঠ কাটিস, ভালো কতা। কিন্তুক রাজাকাররা তোরে ডাকপে ক্যান? তাগের তোরে কী দরকার? আমি তো শুনিছি, রাজাকাররা যারে ক্যাম্পে ডাহে, সে আর ফিরে আসে না, ওরা মাইরে ফেলে তারে।–এই পর্যন্ত বলেই বুলুর মা মতিজান বেগম হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। বাবাও কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন মাটিতে। বুলু তাড়াতাড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে বলে– কান্দার কিছু নেই মা। আব্বা, কোনো ভয় নেই। ঘরে চলো, সব কথা খোলাসা করে কই।

ঘরে গিয়ে গত রাতে আমাদের সাথে মিটিংয়ের সব কথা বাবা-মাকে খুলে বলে বুলু। এমন কী তার গত রাতের স্বপ্নের কথাও বলতে ভোলে না। রাজাকার ক্যাম্পে তার কাঠুরিয়ার কাজ নেয়ার বিষয়টা যে মুক্তিযুদ্ধেরই একটা অংশ, তা বুঝতে পেরে বাবার চোখ খুশিতে চকচক করে ওঠে। মা-ও খুশি, তবে

তাঁর ভয় কাটে না। তিনি ফিস ফিস করে বলেন– বাজানরে, শুনিছি রাজাকাররা নাকি খুব খারাপ। খুব নাকি জল্লাদ ওরা। গুলি করে মানুষ মাত্তি ওগের হাত কাঁপে না। তাই তোরে নিয়ে আমার বড়ো ভয় হচ্ছে বাপ!

বাবাও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় উঠোনে কার যেন হাঁক শোনা যায়– বুলু ভাই ঘরে আছো? বুলু ইশারায় বাবাকে চুপ করতে বলে বাইরে এসে দেখে ছলিম রাজাকার। তেরো-চৌদ্দ বছরের ছিপছিপে লম্বা একটি ছেলে, সাদেকদের গ্রামে বাড়ি। মাথায় একটা ক্যাপ পরা। স্বাস্থ্যটা এত খারাপ যে, দেখতে ওকে তালপাতার সেপাই মনে হয়।

ছলিম বুলুকে দেখেই গদগদ হয়ে সালাম দেয়। তারপর বলে– তুমার জন্যি বড়ো খুশির খবর আছে বুলু ভাই। আমাগের কমান্ডার সায়েব তুমারে ক্যাম্পে চাকরি দেছেন। ভালো চাকরি– কাঠুরে আবার রাজাকার। মাসে মাসে মোটা বেতন। তুমি গেলিই চাকরিডা ফাইনাল। তা বুলু ভাই, এহনি যাতি হয় যে। আমার আবার এট্টু তাড়া আছে।

ছলিমের কথা শেষ হওয়ার আগেই বুলুর বাবা-মা উঠোনে নেমে আসেন। ওদেরও সালাম দেয় ছলিম। তারপর খুশিতে আটখানা হয়ে বলে– চাচা, চাচি, আপনাগের কপাল খুলে গেছে। বুলু ভাই'র চাকরি হয়ে গেছে আমাগের ক্যাম্পে। মোটা বেতন মাসে মাসে।

বুলুর একবার মনে হয় ঘর থেকে কুড়ালটা এনে সোজা বসিয়ে দেয় রাজাকারটার মাথায়। কিন্তু এখন মাথা গরম করা চলবে না। মাথা বরফের মতো ঠান্ডা রাখতে হবে, নইলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই বাবা-মা কিছু বলার আগেই বুলু বলে– আব্বা, মা, খুবই খুশির খবর আনেছে ছলিম, তাই না? ওরে কিছু খাতি দ্যাও মা। আমারে আর আব্বারেও দ্যাও।

–বাজান, ঘরে তো রাতের বাসি ভাত-তরকারি ছাড়া কিছু নেই। ওই ছেলেডা এত বড়ো এট্টা খবর আনল, ওরে কী এসব খাতি দেওয়া যায়... মা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বুলু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে- ভাই ছলিম, তুমি এট্টু বসো। আমি এহনি আসতিছি।–বলেই বুলু এক দৌড়ে বটতলায় সিরাজ আলির দোকানে যায়। সেখান থেকে কিছু মুড়ি আর চানাচুর কিনে নিয়ে বাড়ি আসে। মা সেই মুড়ি-চানাচুর পেঁয়াজ-মরিচ আর তেল-লবণ দিয়ে মেখে প্লেটে করে যখন ছলিমের সামনে দেয়, তখন ছলিম খুব খুশি। হাসতে হাসতে বলে: চাচি, হেভি সেন্ট আসতেছে মুড়ি থে'। খাতি খুব মজা হবেনে– বলতে বলতে মুড়ি খাওয়া শুরু করে ছলিম। বুলুকেও বলে তার সাথে মুড়ি খেতে।

বুলু ছলিমের কথা শুনেও না শোনার ভান করে। তারপর মাকে বলে– মা, শিগগির করে আমারে ভাত দ্যাওদিনি। চাকরিতি জয়েন কত্তি যাতি হবে না?

মা বলে: রান্ধাঘরে আয় বাজান, খাতি দিচ্ছি।

বুলু মায়ের পিছে পিছে যায়। ওর বাবাও ওদের অনুসরণ করেন। রান্নাঘরে গিয়ে একে অন্যের দিকে তাকান, কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই। তবে সবার ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। সে-হাসি বড়ো রহস্যময়, বড়ো অর্থপূর্ণ।

খাওয়া শেষ করে কুড়ালটা কাঁধে নিয়ে বুলু বলে– মা, মিয়াজির কাছে কাঠ ফাঁড়ার যে টাকা পাওনা আছে, তা নিয়ে নিও। তারপর ক্যাম্পে যায়ে দেখি, কী ব্যবস্থা করা যায়। তুমরা এ নিয়ে চিন্তা করবা না। এবার আমি আসি। দোয়া কোরো তুমরা। তা ভা'ডি ছলিম, চলো যাই।

পথে হাঁটতে হাঁটতে ছলিম বলে- বুলু ভাই, আমার পরে তুমার ঘেন্না হচ্ছে, না? আমি রাজাকার হইছি, এ জন্যি ঘেন্না হওয়ারই কতা। কিন্তু রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর কমান্ডার বাবু ভাই কয়েছেন, বড়ো কিছু পাতি হলি অনেক ত্যাগ স্বীকার কত্তি হয়।

ঢ্যাঙা 'রাজাকার' ছলিমের কথা শুনে বুলুর যেন ভিমরি খাওয়ার যোগাড়। ওদের বাড়িতে ওর বাবা-মার সামনে ছলিম যেভাবে কথা বলল, তাতে ওর কিছুতেই বিশ্বাসই হতে চায় না– ছলিম রাজাকার ছাড়া আর কিছু! কিন্তু তা হলে ও বাবু ভাইদের কথা জানলো কী করে! মাথার ভেতর হাজারো চিন্তা

ঘুরপাক খেতে থাকে বুলুর। কোনো কথা যোগায় না মুখে। হঠাৎ কথা বলে ছলিম– বুলু ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না, না? আরে, তুমাগের বাড়ি তো আমার টেরনিংটা এট্টু ঝালাই করলাম। তুমাগের সামনে যেভাবে কায়দা করে কতা কচ্ছিলাম, তাতে তুমি কি আমারে রাজাকার ছাড়া আর কিছু ভাবিছিলে? তো ইডাই হলো আমাগের টেরনিং। আর হ্যাঁ, চাচা-চাচির খাওয়ার চিন্তা তুমার কত্তি হবে না। সাদেক ভাই আছে না? তুমি বেতন পা'য়ে তার টাহা দিয়ে দিও। তুমাগের অবস্থা সাদেক ভাই'র জানা আছে। এ নিয়ে আমার সাথে তার কথাও হয়ছে। তো ব্যাস, ওই ঝামেলা এহানেই শ্যাষ।

এবার যেন প্রাণ ফিরে পায় বুলু, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে ওর। মিষ্টি হেসে ছলিমের হাত ধরে বলে: সাবাস ভা'ডি, সাবাস! তুমারে আমি উস্তাদ মানলাম। আমারে তুমি শিখায়ে-পড়ায়ে নিবা ভাই। আমি কাঠুরে মানুষ। শরীল গরম, রাগ বেশি। হঠাৎ রাইগে যাই। এই যেমন, তুমি যহন আমাগের বাড়ি যায়ে রাজাকারের পক্ষ নিয়ে মিঠে মিঠে কথা কচ্ছিলে, তহন আমার মনে হচ্ছিল– তুমারে কুড়োল দিয়ে কুপায়ে ফাঁইড়ে ফ্যালাই। দেখো তো, তা'লি কী কেলেংকারিডাই না হয়ে যা'তো! যাক্, তা হয়নি। তাই তুমার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধারে পা'লাম।

ছলিম হাসতে হাসতে বলে– ওই রাজাকার ক্যাম্পে খাঁটি বজ্জাত রাজাকার যেমন আছে, তেমনি তুমার-আমার মতো কয়েকজনও আছে, যারা উপরে উপরে রাজাকার; কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাগের গুপ্তচর, মানে খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা। ওই যে আমাগের সাদেক ভাই, উনিও কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাগের গুপ্তচর। এহন তুমি হলে আরেকজন, আমাগের নতুন সাথি। তবে সাদেক ভাই কিন্তু রাজাকারে জয়েন করেনি। উপরে উনার নাকি এক আত্মীয় আছে বড়ো লিডার। তিনি নাকি কায়দা-কৌশল করে উনারে ঠ্যাকায়ছেন। তাই তো সাদেক ভাই এহনও বাইরে থা'হে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাগের পক্ষে কাজ কত্তিছেন। এহানকার রাজাকারে আমাগের সবাইরে তো উনিই ঢোকায়ছেন। আর আজ ঢুকতিছো তুমি। এতে রাজাকারে সাদেক ভাই'র সুনাম যেমন বাড়তেছে, তেমনি ওরা মনে কত্তিছে সাদেক ভাই ওগেরই লোক। তাই তাকে ওরা কোনো সন্দ কত্তিছে না। কিন্তুক আসলে তো সিসেম ফাঁক! বুলু ভাই, দেখলে তো বিধির কী আজব খেলা! ■

শিশুসাহিত্যিক

মারিশা মাহপারা
পঞ্চম শ্রেণি
দোহাকুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাঘারপাড়া

বাংলাদেশের পাখি

মাহবুবুর রহীম

বাংলাদেশে চষে বেড়ায় নানা জাতের পাখি
তাদের রূপে চালচলনে মুগ্ধ সবার আঁখি।
বন-বাদাড়ে ঝোপেঝাড়ে নিত্য বারোমাসে
এই পাখিরা চতুর্পাশে সুরে সুরে হাসে।

পাখির ডাকে সন্ধ্যা নামে সূর্য উঠে ভোরে
দোয়েল নাচে ঘরের পাশে কোকিল ডাকে দূরে।
খালে-বিলে নদী-নালায় মাঠে কি-বা ঘাটে
নানা রঙের পাখপাখালি উড়ে উড়ে হাঁটে।

কাক দেশে বেশি দেখি জাতীয় পাখির চেয়ে
চড়ুই, ঘুঘু সাবাড় করে পরের খাবার খেয়ে।
ময়না, টিয়া, শালিক পাখি শখ করে কেউ পোষে
কেউ অযথা চিল, শকুন আর বাজ পাখিকে দোষে।

বউ কথা কও, ফিঙে, শ্যামা এবং টুনাটুনি
বাবুই পাখির মতো এরা নয়তো এমন গুণি।
পানকৌড়ি, বলাকা পাখি এবং ডাহুক যত
জলে চরে শিকার করে প্রবাস পাখির মতো।

কাঠঠোকরা পাখিরা হলো রং ও রূপের রাজা
ময়ূর হলো পাখির রানি যার হৃদয়টা তাজা।

অতিথি

উৎপল দত্ত

শত শত মাইল পেরিয়ে
আসে অতিথি পাখি
নদী-নালা, খাল-বিলে
তাদের দেখে জুড়ায় আঁখি।

ঝাঁক বেঁধে পাখির দল
উড়ে আকাশ পানে
ইচ্ছেমতো ছুটে চলে
অজানা কোনো স্থানে।

নানান পাখির কোলাহলে
সেজে উঠে প্রকৃতি,
তারাই আমাদের প্রিয়
শীতের অতিথি পাখি।

শীতের পাখি

তৌফিক আলম তুহিন

শীতের পাখি বলো দেখি
কোথায় তোমার বাড়ি
এসে তুমি যাও চলে
তাই তো দিলাম তোমায় আড়ি।

তুমি যখন এসে থাকো
নদী-নালা মাঠে-ঘাটে
তোমায় দেখতে না পেলে
মন বসে না পাঠে।

একাদশ শ্রেণি, কুমিল্লা মডার্ন স্কুল, কুমিল্লা

গল্প

রুমকি আর পিংকি

শিবশঙ্কর পাল

'দেখো এই যে সামনে পূজা আসছে, ধরো মহালয়ার আগের দিন থেকে আগ্রহ নিয়ে আছি সকাল হলেই টিভিতে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখব।... হঠাৎ দেখা গেল কারেন্ট নেই, কিংবা ডিস-লাইন চলে গেল, তখন? তখন কেমন লাগে!'

'আমারও তো এমন হয়!... মা তো এমনিতেই টিভি দেখতে দেয় না। যা-ও বা একটু কার্টুন দেখতে বসি অমনি কারেন্ট অফ! তখন? তখন ভালো লাগে!'

রুমকি আর পিংকি। এভাবেই প্রতিদিন বিকেলে কথা বলে, নিজেদের ভেতরে গল্প করে। অথচ ওদের নিজেদের ইচ্ছা থাকলেও কেউ কাউকে ছুঁয়ে দেখতে পারে না। না, মোবাইল ফোন বা মাঝখানে দেয়াল নেই ওদের। কিন্তু ওদের দুই বাসার দূরত্বের মাঝখানে আছে একটা চিকন রাস্তা। যে রাস্তায় কেবল একটা রিকশা কোনোমতে ঢুকতে পারবে। তবে এই রাস্তায় কোনোদিন রিকশা ঢোকে না। মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করে। এটা ছোট্ট একটা পাড়ার রাস্তা। রুমকি আর পিংকিদের বাসা দুটো পাড়ার রাস্তার মুখেই পাঁচতলা বিল্ডিং। ওরা থাকে তৃতীয় তলায়। রুমকির বাবা একটা কলেজের প্রভাষক, আর পিংকির বাবা পোস্ট অফিসের চাকরি করেন। দুটো পরিবারই ভাড়া থাকে। বিল্ডিং দুটো মুখোমুখি হলেও প্রত্যেক তলার ব্যালকনি গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেই ব্যালকনির গ্রিলের ভেতর দাঁড়িয়ে রুমকি আর পিংকি প্রত্যেকদিন কথা বলে।

রুমকি আর পিংকি সমবয়সি, দুজনেই ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। তবে আলাদা আলাদা স্কুলে। তাই বাসা থেকে বেরুনোর সময় হঠাৎ হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়, কিন্তু হাই-হ্যালো ছাড়া কোনো কথা হয় না। সে সময় তাদের সাথে থাকে মায়েরা। স্কুল থেকে ফেরার সময় কারো সাথে কারো অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। আবার একজন আরেকজনের বাসায় গিয়ে যে গল্প করবে তারও উপায় নেই। স্কুল-প্রাইভেট, ঠিক সময়মতো খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি মিলিয়ে টাইট সিডিউল। আর অবসরে মাকে বললেও কাজ হয় না। এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ যাওয়া সম্ভব হয়

না। মায়েদেরও সেসময় অনেক কাজ থাকে।
তবে রুমকি আর পিংকি দুজনেই মাঝেমধ্যে ফুল বিনিময় করে। নিজেদের ব্যালকনির টবে লাগানো গাছের ছোটো ছোটো ফুল লোহার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ছুড়ে মারে একে অন্যের দিকে। কোনোটা ফাঁক দিয়ে পৌঁছে আবার কোনোটা গ্রিলের গায়ে বাধা পেয়ে নিচে পড়ে যায়। আবার, বর্ষার দিনে রুমকি আর পিংকি দুজনেই একটা খেলা খেলে। আকাশে কালো মেঘ জমলেই দুজনে চলে আসে ব্যালকনিতে। অপেক্ষা করে কখন বৃষ্টি আসবে কখন বৃষ্টি আসবে? বার কতক মেঘ ডেকে যখন বৃষ্টি আসে তখন শুরু হয় ওদের খেলা। লোহার গ্রিলের ফাঁকে হাত বাইরে দিয়ে হাতের তালুতে জল ধরে। তারপর একে অন্যের দিকে ছুঁড়ে মারে। এইভাবে এই খেলা চলে তাদের অনেকক্ষণ ধরে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একে অন্যকে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে দিতে না পারছে ততক্ষণ। আর এই খেলাতে দুজনেই বেশ মজা করে। বাড়ির অন্যরা কেউ এখনো পর্যন্ত তাদের এই খেলা দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে হয়ত তাদের শাসনে অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত।
তবে এতসব বাধার মধ্যেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দুজনের মধ্যে কাছাকাছি দেখা হয়। হাসিখুশির মধ্যে কথা হয়। মনের ভাব আদান-প্রদান হয়। রুমকি শোনায় তার স্কুলের গল্প, বন্ধুদের কথা। পিংকিও বলে ওর স্কুলের গল্প, বন্ধুদের কথা। আবার দুর্গাপূজায় দুজনেই পাড়ার মন্দিরে পাশাপাশি বসে একসাথে পূজা দেখে। এই তো সেদিন ছিল রুমকির জন্মদিন। পিংকি ওর মায়ের সাথে এসেছিল সেই অনুষ্ঠানে। এক সাথে কেক কাটল, খুব করে হইচই করে আনন্দ করল। আবার তারও আগে রুমকি পিংকির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল মায়ের সাথে।
কয়েক মাস পরের কথা। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় রুমকি ওর মায়ের সাথে যায় পিংকিদের বাসায়। সেদিন রুমকির মনটা আনন্দে ভরে ওঠার বদলে গম্ভীর হয়ে থাকে। যেন রাজ্যের কালো মেঘ এসে ভর করেছে রুমকির চোখ-মুখ এবং মনেও। পিংকিদের বাসায় যেতে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে দুজনের পায়ের স্যান্ডেলের শব্দ হয় খট খট করে। তৃতীয়তলায় উঠে পিংকিদের বাসার কলিংবেল বাজালে পিংকির মা এসে দরজা খুলে দেয়। দুজনেই হাসিমুখে কথা বলা শুরু করলেও রুমকি মুখ গোমড়া করে থাকে। রুমকি পিংকিকে ঘরের ভেতর খোঁজে। কিন্তু পিংকি কোথাও নেই। পিংকির মা রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মামনির মুখটা ভার কেন?' রুমকির মা নিচুগলায় বলল, 'ওর মনটা খারাপ। দিদি, কালকে আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ওর বাবা বদলি হয়েছে।'
রুমকির মায়ের কথা শুনে পিংকির মায়ের মন খারাপ হলো। পিংকিকে ডাকলে ও ঘরে এসে দাঁড়ালো। রুমকি ওর কাছে গিয়ে বলল, 'কাল আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের আর দেখা হবে না–' বলেই রুমকি পিংকিকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ওদের মুখে কথা নেই। শুধু একে অপরকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ■

গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক

সিরাজুম মুনিরা বিভা
কেজি-১
সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়
ঢাকা

যেখানে সূর্য অস্ত যায় না

মো. ইকবাল হোসেন

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সকালে সূর্য উদিত হয়, সন্ধ্যায় অস্ত যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বে এমন জায়গাও আছে যেখানে সূর্য উদিত হলে অস্ত আর যায় না। যদিও অস্ত যায় দিনের পরদিন বা মাসের পর মাস সূর্যের আর দেখা মিলে না। বন্ধুরা, বিষয়টি অবিশ্বাস্য হলেও একেবারেই সত্যি। জেনে নেই পৃথিবীর এমন ৬টি স্থান সম্পর্কে।

নরওয়ে

নরওয়েকে নিশীত সূর্যের দেশ বলা হয়। এখানে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় ৭৬ দিনের জন্য সূর্য অস্ত যায় না। আকাশে তখন প্রায় ২০ ঘণ্টা সূর্যের দেখা মিলে। নরওয়ের স্যালবার্ডে এলাকায় ১০ই এপ্রিল থেকে ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত একটানা সূর্য দেখা যায়। যখন সূর্য ১২:৪৩ মিনিটে অস্ত যায় এবং মাত্র ৪০ মিনিট পর উদিত হয়। রাত দেড়টা হতে না হতেই সকাল হয়ে যায়। এছাড়াও নরওয়েতে এমন একটি জায়গা রয়েছে যেখানে ১০০ বছর ধরে সূর্যের আলো যায়নি।

আইসল্যান্ড

আইসল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেনের পরে ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপ। দেশটিতে সূর্য কখনোই পুরোপুরি অস্ত যায় না। এখানে ১০ই মে থেকে জুলাই পর্যন্ত দিন থাকে, সূর্য কখনো অস্ত যায় না। কারণ সূর্য সব সময় দিগন্তের উপরে থাকে। মেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় মধ্যরাতে সূর্য অস্ত যায় এবং ভোর ৩টায় ফের উদিত হয়।

কানাডা

কানাডা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। দেশটির ইনুভিক

এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীষ্মে প্রায় ২ মাস সূর্যের আলো দেখা যায়। এছাড়াও দেশটি সারা বছরই তুষারে ঢাকা থাকে।

আলাস্কা

আলাস্কায় মে মাসের শেষ থেকে জুলাই পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না। আবার শীতে সেখানে সূর্যের দেখা মিলে না। শীতের শুরুতে ১ মাস শুধু রাত থাকে। তাই এ সময়টিকে বলা হয় পোলার নাইট।

সুইডেন

সুইডেন একটি সুন্দর দেশ। এখানে মে মাস থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত রাত ১২ টায় সূর্য অস্ত যায় এবং ভোর সাড়ে ৪ টায় উদিত হয়।

ফিনল্যান্ড

হ্রদ ও দ্বীপের দেশ ফিনল্যান্ড। দেশটির বেশ কিছু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সূর্যের আলো প্রায় ৭৩ দিন থাকে, অথচ শীতকালে সূর্যের দেখা মিলে না। মধ্যরাতের সূর্যটি আর্কটিক বৃত্তের উপরে উজ্জ্বল হয় এবং সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে দিগন্তের বাইরে চলে যায় এবং আবার উদিত হয়। যার ফলে শেষ রাত এবং ভোরের মধ্যে সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যায়। ■

এরিয়া ম্যানেজার, একমি ল্যাবরেটরিজ, ঢাকা

সকাল হলো

মো. তৈয়বুর রহমান ভূঁইয়া

ফুল বাগানে ফুল ফুটেছে
মৌমাছিদের মৌ জুটেছে
দোয়েল, শালিক গান ধরেছে
গাছের ডালে বসে,
রাখাল ছেলে গরু নিয়ে
মাঠে বেড়ায় চষে।
ওই যে দেখো সবুজ ঘাসে
শিশিরকণা হাসে,
মাছ-পাখিরা মাছের আশায়
থাকে পুকুর পাশে।
ওই যে জেলে জাল ফেলেছে
যাচ্ছে কৃষক কাজে,
ফড়িংগুলো উড়ছে দেখো
ধানের পাতার ভাঁজে।
উঠল বুঝি পুব আকাশে
মোরগ পাখির চোখ,
এসব দেখে ছোট্ট খুকু
পায় যে অনেক সুখ।
খুকুর কথা, 'সকাল হলো
নয়কো আঁধার রাত,
ওই যে দেখো তাঁতি পাখি
বুনছে সে কী তাঁত!'

একাদশ শ্রেণি, সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ
শিবপুর, নরসিংদী

ফুটবলের মহা আসর

শেষ হলো আলোচিত কাতার বিশ্বকাপ। ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ফ্রান্সকে হারায় আর্জেন্টিনা। এর ফলে তারা ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলল। অবসান হলো ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ ট্রফি ছোঁয়ার প্রতীক্ষা। এবারের বিশ্বকাপে খেলোয়াড় ও সমর্থকদের যেমন ছিল হাসি-কান্না, তার পাশাপাশি ছিল অনেক স্মরণীয় মুহূর্তও। সবার কাছে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ ছিল স্মরণকালের সেরা আসর। টুর্নামেন্টের আলোচিত কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরলাম নবারুণ বন্ধুদের জন্য–

মরক্কোর ইতিহাস: এবারের বিশ্বকাপের আগে আফ্রিকার ফুটবল দলগুলোর সেরা সাফল্য ছিল কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা। কিন্তু কাতার বিশ্বকাপে দারুণ খেলে সবাইকে চমকে দিয়ে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে শেষ চারে ওঠে মরক্কো। সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাস । সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় তারা। এর আগে বেলজিয়াম, স্পেন ও পর্তুগালের মতো শক্তিশালী দলগুলোকে হারিয়ে দেয়।

সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনার হার: এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড়ো আপসেট ছিল গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনার হার। এই ম্যাচ সৌদি আরব আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারায়। এ ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনা তিন বছর অপরাজিত ছিল। ম্যাচে প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে আর্জেন্টিনা গোল পায়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনার জালে ২ গোল দিয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সৌদি আরব।

জাপানের কাছে জার্মানির হার: কাতার বিশ্বকাপের দ্বিতীয় বড়ো ঘটনা ছিল জার্মানির বিরুদ্ধে জাপানের জয়। বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিনেই চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে ২-১ গোলে হারায় জাপান। পরবর্তীতে জার্মান স্পেনের সঙ্গে ড্র করে ৮০ বছরের মধ্যে প্রথমবার নকআউট পর্বের আগেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়।

ম্যাচ পরিচালনায় তিন নারী রেফারি: ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ম্যাচ পরিচালনা করেন তিন নারী রেফারি। গ্রুপ-ইতে জার্মানি বনাম কোস্টারিকার ম্যাচে প্রধান রেফারি হিসেবে ছিলেন ফ্রান্সের স্টেফানি ফ্রাপার্ট। তার সহযোগী ছিলেন ব্রাজিলের নেউজা ইনেস ও মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ।

রোনালদোর স্বপ্নভঙ্গ: কাতার বিশ্বকাপই সম্ভবত পর্তুগাল তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টে মরক্কোর কাছে ১-০ গোলে হেরে বিদায় নেয় পর্তুগাল। ম্যাচের পর রোনালদোর অশ্রুসিক্ত মাঠ ছাড়ার দৃশ্য সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

নেইমারদের নতুন নৃত্য: বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিল বিদায় নিলেও দলের নতুন নৃত্য মন কেড়েছে ভক্তদের। বিশ্বকাপে ফেভারিট হিসেবেই শুরু করে তারা, তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হেরে যায় নেইমারের দল। এর আগে ব্রাজিলের খেলোয়াড় রিচার্লিসনের নেতৃত্বে ব্রাজিল বিশ্বকাপে দেখায় পিজিওন ড্যান্স বা কবুতর নাচের। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে নেইমারদের ফুটবল দক্ষতার পাশাপাশি নাচের দক্ষতাও দেখে বিশ্ব।

অন্যতম সেরা ফাইনাল: বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেরা খেলা ফাইনালে দেখলো বিশ্ববাসী। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের মধ্যকার এ ম্যাচে টাইব্রেকের আগে দু দলই তিনটি করে গোল পায়। হ্যাটট্রিক করে ফাইনালে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

আমাদের মেসি

সুজিত হালদার

খেলছে মেসি ছুটছে মেসি
ফুটবলের রাজা সে!
জিতল এবার আর্জেন্টিনা
কোমর বেঁধেছে যে।

খেলছে মেসি হাসছে মেসি
দে একটা গোল দে
ভক্তরা সব নাছোড়বান্দা
হারায় তাদের কে।

লক্ষ তারার একটা তারা
খেলা মাঠের মেলাতে
ছন্দ গতির নেই তুলনা
ফুটবলের খেলাতে।

বল দখলে নেই জুড়ি যার
সে আমাদের মেসি
ড্রিবলিং আর বল দখলে
খাটায় না তো পেশি।

কালো মানিকের বিদায়

জুনায়েদ কবীর

কিংবদন্তি ফুটবলার এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো, যিনি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পেলে নামেই পরিচিত, যাকে আমরা ফুটবলের রাজা বলে জানি তিনি সারা বিশ্বের ভক্ত সমর্থককে কাঁদিয়ে ২০২২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে চলে গেলেন পরপারে। চার দশকেরও বেশি সময় আগে ১৯৭৭ সালে ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি।

অবসর নেওয়া সত্ত্বেও সাবেক এই খেলোয়াড় সারা দুনিয়ায় এখনো সবচেয়ে পরিচিত ও সম্মানিত ফুটবলারদের একজন। মূলত তিনবার বিশ্বকাপ জয় করার জন্য পেলে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়- যে কিনা তিনবার বিশ্বকাপ জয় করেছেন। এছাড়াও তিনি তার ক্লাব ও দেশের হয়ে ১,৩৬৩টি ম্যাচ খেলে মোট ১,২৮১টি গোল করেছেন ।

ফুটবল খেলায় পেলে যে দক্ষতা ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সেটা মানুষের কল্পনার সীমাকেও ছাড়িয়ে

গিয়েছিল। পেলে আক্রমণভাগের খেলোয়াড় হিসেবে খেলতেন। তাকে ফুটবলের সম্রাটও বলা হয়। ব্রাজিলের হয়ে তিনি ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তিনি ব্রাজিলের জাতীয় দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

পেলে ১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর ব্রাজিলের মিনাস জেরাইসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা দন্দিনহো এবং মাতা সেলেস্তে আরান্তেস। তার পিতাও একজন ফুটবলার ছিলেন। তিনি ফ্লুমিনিস ফুটবল ক্লাবে খেলতেন। পেলে দুই ভাই-বোনের মধ্যে বড়ো ছিলেন এবং মার্কিন উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসনের নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছিল। তার বাবা-মা তাকে 'এডসন' বলে ডাকাতেন। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি 'পেলে' ডাকনামটি পান। ধারণা করা হয়, পেলে নিজেই তার ডাকনামটি দিয়েছিলেন। পেলে তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন– নামটির অর্থ কী তা নিয়ে তার এবং তার পুরোনো বন্ধুদের তখন কোনো ধারণা ছিল না। নামটি 'বিলে' থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং হিব্রু ভাষার এটির অর্থ 'অলৌকিক'।

পেলের বাবাই পেলেকে ছোটোবেলায় ফুটবল খেলা শেখান, ছোটোবেলা থেকেই তার ফুটবল খেলার নেশা এত বেশি ছিল যে মোজার ভিতর সংবাদপত্র, দড়ি বা আঙুর ঢুকিয়ে বল বানিয়ে খেলতেন। এমনকি জাম্বুরা দিয়েও ফুটবল খেলতেন।

১৯৫৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর করিন্থিয়ান্স দে সান্তো আন্দ্রের বিপক্ষে ১৫ বছর বয়সে পেলের অভিষেক ঘটে এবং ৭-১ গোল ব্যবধানের জয়ে তিনি আকর্ষণীয় পারফরম্যান্স করেন। এই ম্যাচেই পেলে তার দীর্ঘ কর্মজীবনের প্রথম গোলটি করেন। পেলে ১৯৫৭ সালের ৭ই জুলাই মারাকানা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন। ২-১ গোলের ব্যবধানে হারা সেই ম্যাচে ১৬ বছর ৯ মাস বয়সে ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম গোল করে পেলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে ১৯৫৮ সালে পেলে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেন। সেই বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ এবং তখন পর্যন্ত যে-কোনো বিশ্বকাপ খেলায় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় তিনি। ওয়েলসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে পেলে প্রথম যে গোলটি করেন সেটি ছিল সেই ম্যাচের একমাত্র গোল, যার সাহায্যে ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠে। তখন পেলের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর ২৩৯ দিন যা বিশ্বকাপের গোলদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সি খেলোয়াড়।

পেলের সান্তোস এফসি ফুটবল ক্লাব ছিল ষাটের দশকে বিশ্বের জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর একটি। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই ক্লাবটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নিত। এই খ্যাতির কারণে তারা বাড়তি কিছু সুবিধাও পেয়েছিলেন। এরকম একটি প্রীতি ম্যাচ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত নাইজেরিয়ায়, ১৯৬৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। বেনিন সিটিতে অনুষ্ঠিত ওই খেলায় সান্তোস ২-১ গোলে স্থানীয় একাদশকে পরাজিত করে।

১৯৭০ সালে আগের বিশ্বকাপের ব্যর্থতা মুছে ফেলে আবারও শিরোপা জিতে নেয় পেলের দেশ ব্রাজিল। টানা চারটি টুর্নামেন্টের তিনটিরই ট্রফি ওঠে তাদেরই হাতে। পেলে খেলেন তার চতুর্থ বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচটি। প্রতিটি ম্যাচে গোল করেন জেয়ারজিনহো। ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে গুঁড়িয়ে দেয় ক্যাপটেন কার্লোস আলবার্তো। দল তিনবার শিরোপা জেতায় জুলে রিমে ট্রফিটা একেবারেই দিয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিলকে। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন পেলে। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের পর নিজেকে সর্বকালের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে প্রমাণ করেন।

১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছর তিনি ব্রাজিলের ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৬ সালে পেলের জীবনকাহিনি নিয়ে 'পেলে : বার্থ অব অ্যা লিজেন্ড' নামক একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এই চলচ্চিত্রে তার জীবনের উত্থান-পতন ও সব অর্জন তুলে ধরা হয়েছে। ■

প্রাবন্ধিক

চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

তৃতীয়বারের মতো বিশ্বের ১৬২টি দেশের ৫ হাজার ৩২৭টি দলকে হারিয়ে 'নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ-২০২২'-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। মোস্ট ইন্সপিরেশনাল ক্যাটাগরিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের 'টিম ডায়মন্ডস'। নাসার সহযোগিতায় দেশের সফটওয়্যার ও সেবাপণ্য নির্মাতাদের সংগঠন বেসিস এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (নাসা) ৮ই ডিসেম্বর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে। এ দলটি ১০-১২ বছরের শিশুদের মহাকাশ সম্পর্কে জানাতে 'ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই' নামে একটি অ্যাপ তৈরি করে।

তাদের প্রজেক্ট 'ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই' একটি ইন্টার‍্যাক্টিভ গেমভিত্তিক স্পেস লার্নিং সিস্টেম। গেমটির মাধ্যমে শিশুরা তাদের নিজস্ব নক্ষত্র তৈরি থেকে শুরু করে নক্ষত্রগুলোর প্যাটার্ন, রঙের পরিবর্তন, উজ্জ্বলতা, ভরের পরিবর্তন অনুমান করতে পারবে। উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাচ্চাদের তারার ঝিকিমিকি, রাতের আকাশের ধীরগতি পরিবর্তন এবং কেন ঘটে তা বোঝার সুযোগ দেওয়া। অ্যাপটি মানুষকে ছোটোবেলা থেকেই মহাকাশের অজানাকে জানাতে এবং অদেখাকে দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২০১২ সাল থেকে বৈশ্বিকভাবে এই প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করে আসছে নাসা। সাধারণত প্রতি বছরের অক্টোবর মাসে প্রতিযোগিতাটির চূড়ান্ত হ্যাকাথন অনুষ্ঠিত হয়। স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জ মূলত প্রোগ্রামার, বিজ্ঞানী, ডিজাইনার, প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী ৩৮৫টিরও বেশি শহরে প্রতি বছর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৯টি শহর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল ও কুমিল্লা রয়েছে।

'টিম ডায়মন্ডস' এর সদস্যরা হলেন-টিম লিডার টিসা খন্দকার, ইউএক্স ডিজাইনার মুনিম আহমেদ, সিস্টেম আর্কিটেক্ট ইঞ্জামামুল হক সনেট, অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার আবু নিয়াজ ও মেন্টর হিসেবে ছিলেন ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সফটওয়্যার প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খালেদ সোহেল এবং রিসার্চার জারিন চৌধুরী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী।

টিম ডায়মন্ডসের সদস্যরা পুরস্কার হিসেবে নাসার একটি কেন্দ্র পরিদর্শনসহ মহাকাশযান উৎক্ষেপণ দেখার সুযোগ পাবে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

গৌতম বুদ্ধের কিছু অসাধারণ বাণী

নুসরাত জাহান

গৌতম বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন ছবি দেখে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতি কাজ করে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'–এই বাণী উচ্চারণ করে বিশেষ পোশাক পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পথচলা সত্যিই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি বা আমাদের আনন্দ দেয়। শান্তি এবং অহিংসার পথে গৌতম বুদ্ধ যে কোটি কোটি মানুষকে আনতে পেরেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভেবে আমরা হতবাক হয়ে যাই।

গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি বাণী আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেছেন–

- তুমিই কেবল তোমার রক্ষাকর্তা, অন্য কেউ নয়।
- সবকিছুর মধ্যে মনই আসল। সবার আগে মনকে উপযুক্ত করো, স্থিতিশীল হও। আগে ভাবো তুমি কী হতে চাও।
- আনন্দ হলো বিশুদ্ধ মনের সহচর। বিশুদ্ধ

চিন্তাগুলো খুঁজে খুঁজে আলাদা করতে হবে। তাহলে সুখের দিশা তুমি পাবেই।

- জীবনে প্রথম ভুল হওয়ার মানে এই নয় যে, এটিই সবচেয়ে বড়ো ভুল। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাও।
- অনিয়ন্ত্রিত ভুল মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। মনকে প্রশিক্ষিত করতে পারলে চিন্তাগুলোও তোমার দাসত্ব মেনে নেবে।
- তোমাদের সবাইকে সদয়, জ্ঞানী ও সঠিক মনের অধিকারী হতে হবে। যতই বিশুদ্ধ জীবনযাপন করবে, ততই উপভোগ করতে পারবে জীবনকে।
- আমরা অনেকেই একটা কিছুর সন্ধানে পুরো জীবন কাটিয়ে দিই। কিন্তু তুমি যা চাও তা হয়ত এরই মধ্যে পেয়েছ। সুতরাং এবার থামো।
- সুখের জন্ম হয় মনের গভীরে। এটি কখনো বাইরের কোনো উৎস থেকে আসে না।
- অন্যের জন্য ভালো কিছু করতে পারাটাও তোমার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- অনেক মোমবাতি জ্বালাতে আমরা কেবল একটি মোমবাতিই ব্যবহার করি। এর জন্য এই মোমবাতিটির আলো মোটেও কমে না। সুখের বিষয়টিও এমনই।
- অন্যকে কখনো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো না। নিয়ন্ত্রণ করো শুধু নিজেকে।
- ঘৃণায় কখনও ঘৃণা দূর হয় না। অন্ধকারে আলো আনতে তোমাকে কোনো কিছুতে আগুন জ্বালাতেই হবে।
- শুভ সূচনা করতে প্রত্যেক নতুন সকালই তোমার জন্য এক একটি সুযোগ।

কী অসাধারণ সব বাণী। আমার তো মনে হয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের, সব মানুষের জন্যই এগুলো চিরন্তন সত্য। ধর্মের নামে হিংসা বা ঘৃণা না ছড়িয়ে আমরা যদি মানুষের ভালোবাসার শিক্ষা ছড়িয়ে দেই, তাহলেই পৃথিবীটা মানুষের সত্যিকার বাসযোগ্য হবে। ■

সম্পাদক, নবারুণ

ওয়ার্ল্ড বুকে আনিসা

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এবার নাম লেখালেন বাংলাদেশের পুঁতি শিল্পী (বিড আর্টিস্ট) আনিসা মুরশেদ। 'লংগেস্ট থ্রেড অব বিডস মেড বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইন ওয়ান আওয়ার' শিরোনামে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেন তিনি। এ বিশ্ব রেকর্ডে বর্তমানে আনিসাই একমাত্র একক খেতাবধারী বাংলাদেশি নারী।

মার্কেটিং ও কনটেন্ট বিশেষজ্ঞ আনিসা শখের পেশা হিসেবে 'হেই আনিসে' প্রোজেক্ট শুরু করেছিলেন ২০২১ সালে। সৃজনশীল মনোভাব থেকে ভিডিওর মাধ্যমে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন অনন্য পুঁতি শিল্পকে। আনিসা রেকর্ড গড়তে এক ঘণ্টায় ৪২.৩ মিটার লম্বা পুঁতির মালা তৈরি করেছিলেন। তাতে ছিল মোট ১৬৭১টি পুঁতি। একই শিরোনামের পূর্বের রেকর্ডটি ছিল ৩২.৭ মিটার, যা থেকে আনিসা প্রায় ১০ মিটার বেশি তৈরি করে অফিশিয়ালি বিশ্বরেকর্ডটি করেন। রেকর্ড গড়ার প্রায় আড়াই মাস পর ১লা নভেম্বর ২০২২- এ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি আসে। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।

আনিসা মুর্শেদ ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন পুঁতি শিল্পী। মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই তিনি পুঁতি শিল্পকে অন্যতম শখের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। পুঁতি শিল্প নিয়ে মিডিয়ায় প্রকাশিত অভিমতে তিনি বলেন, পুঁতির কাজ শুধু একটি কারুকাজ নয়, এটি একটি চর্চা, যা সৃজনশীলতা, একাগ্রতা এবং ধৈর্য বিকাশে সহায়তা করে। আমার এ উদ্যোগের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের কারিগরদের পুঁতি শিল্প গ্রহণ করতে, এটি থেকে উপার্জন করতে এবং সর্বোপরি স্থানীয় পুঁতি শিল্প উদ্যোগকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত করতে চাই।

উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের একক খেতাব পেয়েছেন ১৫ জনেরও কম ব্যক্তি। এর মধ্যে বাংলাদেশের একমাত্র নারী হিসেবে এই একক খেতাব পেলেন আনিসা। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

নাসার গবেষক

আমাদের বন্ধু নরসিংদীর ছেলে আল ইমরান। ছোটোবেলা থেকেই ইমরানের ছিল মহাকাশ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল। মহাকাশ নিয়ে তার ছোটোবেলার এই আগ্রহ শেষ পর্যন্ত তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)'র জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি (জেপিএল)-এর গবেষক বানিয়েছে। চলতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার জেপিএলে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন। মঙ্গলগ্রহে প্রাণের সম্ভাব্য বসবাস যোগ্য পরিবেশ অনুসন্ধানে (ডিসকভারি) কাজ করবেন তিনি। ইমরানের বাড়ি নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের পশ্চিম রামপুর গ্রামে। ইমরানের নাসায় যোগদানের খবরে ফেসবুকে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন তার স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও এলাকাবাসী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ২০১৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামার আর্বান ইউনিভার্সিটিতে প্ল্যানেটারি জিওসায়েন্সে মাস্টার্স করেন তিনি। অর্জন করেন পূর্ণ সিজিপিএ-৪। পিএইচডি শেষে যোগ দেন জেপিএল গবেষক হিসেবে। আল ইমরানের নাসার বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার গল্প অনুপ্রেরণা জোগাবে এ দেশের শিক্ষার্থীদের।

মুখ দিয়ে ছবি এঁকে প্রথম

জীবনে যত বাধাই আসুক না কেন প্রতিভাকে কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। যুক্তরাজ্যের হাসপাতালে তারই বাস্তব প্রমাণ দিলেন সিলেটের বিয়ানীবাজারের মেয়ে শাহানুরি। বড়োদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রিসমাস কার্ডের ডিজাইন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে মুখ দিয়ে ছবি এঁকে প্রথম হয় সে। ১৩ বছরের কিশোরী শাহানুরি বিয়ানীবাজার উপজেলার বড়দেশ গ্রামের জাকারিয়া মাহমুদের মেয়ে। ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সে প্যারালাইজড হয়ে পড়ে। তারপর দেশের চিকিৎসার পর আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য ৬ মাস আগে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। সম্প্রতি হাসপাতালে থাকা অবস্থায় যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস আয়োজিত একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে শাহানুরি। সেখানে সে মুখ দিয়ে ক্রিসমাস কার্ডের চমৎকার ডিজাইন করে। প্রতিযোগীতায় শাহানুরি প্রথম হওয়ায় হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অভিভাবক অত্যন্ত খুশি। ওয়ালসাল হেলথকেয়ার নামে দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শাহানুরির এ অর্জন অসুস্থতা ও সকল প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে নিজের মেধা ও প্রতিভা প্রকাশে সকলের আগ্রহ বাড়াবে।

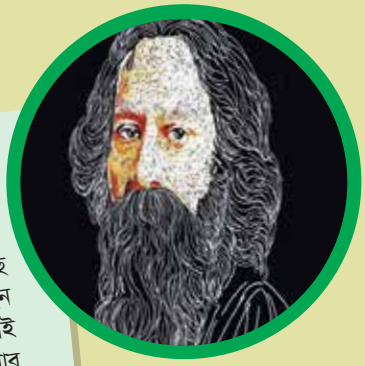

গাণিতিক সমীকরণে চিত্রকর্ম

রং পেনসিল বা রংতুলির আঁচড়ে নয়, গণিত ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে অসাধারণ সব চিত্রকর্ম। এই অবিশ্বাস্য কাজটি করে দেখিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। নাম মিথুন দে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী। করোনার সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন সময়ে অলস বসে না থেকে অনেকেই শিখেছেন নানান কিছু। সেই দলে আছেন মিথুন দে ও। তিনি শিখেছেন ছবি আঁকার গাণিতিক পদ্ধতি। কি দারুণ একটি প্রতিভা তাই না বন্ধুরা! সমীকরণ লিখেই বঙ্গবন্ধু, মেসি, রোনালদো কিংবা বাংলাদেশের মানচিত্রসহ এঁকেছেন অনেক কিছু। সমীকরণে ছবি আঁকার পদ্ধতি, ইকুয়েশন প্রভৃতি রিসার্চ করতে তার সময় লেগেছে প্রায় ছয় মাস। গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে এক একটি ছবি আঁকতে সময় লাগে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা। সমীকরণ ব্যবহার করতে হয় ৩৫০ থেকে ৬০০ এর মতো। মিথুনের এই ধৈর্য ও পরিশ্রম দেখে বিমোহিত সহপাঠী ও শিক্ষক সবাই। ভবিষ্যতে একটি সফটওয়্যার তৈরির ইচ্ছা রয়েছে মিথুন দের।

প্লাস্টিক বোতলে ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী

ফেলে দেওয়া প্রায় লাখখানেক প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে সাজানো হলো ব্যতিক্রমী এক প্রদর্শনী। উদ্দেশ্য হলো প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষায় পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা। মহাখালী টিএনটি মাঠে চলা এই প্রদর্শনীর শিরোনাম 'সেভ আর্থ সেভ বাংলাদেশ'। প্রদর্শনীটি খোলা মাঠে যতদূর চোখ যায় শুধু পরিত্যক্ত বোতল আর চিপসের প্যাকেট। এসব বোতল দিয়ে তৈরি হয়েছে শৈল্পিক মাছ, কচ্ছপ, মানুষের মাথার মগজ, গ্রেনেড প্রভৃতি। প্লাস্টিকের বোতলের আদলে সেজেছে নান্দনিক একটি স্টেজ। প্রদর্শনীতে প্রবেশের গেটগুলো চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে দর্শনার্থীদের। পরিত্যক্ত এসব জিনিস দিয়ে গড়া অপরূপ এই সৌন্দর্য তারা ফ্রেমবন্দি করে রাখছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২ লক্ষ প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি। বিডি ক্লিন সংগঠনের এই আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষকে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে সচেতন করা। যাতে নদীর প্রাণীকূল ও অক্সিজেন সরবরাহকারী গাছগুলোকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানো যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিবেশ দূষণের এ বার্তাটি পৌঁছে দিতে চান আয়োজকেরা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ছোটোদের আঁকা

নাইচ আক্তার, পঞ্চম শ্রেণি, চকভগবানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাইবান্ধা

মালিহা খানম, তৃতীয় শ্রেণি, প্রতিভা কিন্ডারগার্টেন হাই স্কুল, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

হৃদয় বিশ্বাস রিক, চতুর্থ শ্রেণি, বনফুল আদিবাসী গ্রীনইটি কলেজ, ঢাকা

আয়ান হক ভূঁঞা, তৃতীয় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ১২১২।

নিপাহ রোগ বিষয়ক জরুরি স্বাস্থ্যবার্তা

নিপাহ একটি ভাইরাসজনিত ভয়াবহ রোগ, যা বাদুড় থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। সাধারণত শীতকালে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। খেজুরের কাঁচা রস পান করলে নিপাহ রোগ হতে পারে। অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগ থেকে এই রোগের মৃত্যুহার অনেক বেশি, প্রায় ৭০ শতাংশ। প্রতিরোধই হচ্ছে এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। খেজুরের রস ফুটিয়ে নিলে নিপা ভাইরাস মরে যায়।

নিপাহ রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ

- জ্বরসহ মাথাব্যথা
- খিঁচুনি
- প্রলাপ বকা
- অজ্ঞান হওয়া
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট

নিপাহ রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- খেজুরের কাঁচা রস পান করবেন না
- কোনো ধরনের আংশিক খাওয়া ফল খাবেন না
- ফলমূল পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে খাবেন
- নিপাহ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করুন
- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন

খেজুরের রস ফুটিয়ে নিলে নিপা ভাইরাস মরে যায়
কোন অবস্থাতেই খেজুরের কাঁচা রস পান করবেন না

জুনোটিক ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

DGHS MOH&FW BANGLADESH

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-07, January 2023, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

ঘরের চালে কুমড়ো ফুল, সরিষা ফুল মাঠে
ভোর সকালে শিশু-কিশোর চাদর গায়ে পাঠে

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা